102.Qb.405.20

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত-
সম্পাদিত।

NATIONAL LIBRARY
No. Mp. 3926
DATE 27/8/09
CALCUTTA

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভাদ্র—চৈত্র।

১৩১৩

BENGAL LIBRARY
WRITERS BUILDINGS
7. JUN. 1907

RARE BOOK

কলিকাতা;
২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

IMPERIAL LIBRARY

চিত্রের সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
আকবর	৫৬
আনন্দমোহন বসু	৩৩
আনন্দমোহনের জননী	৪৮
আমীর	২০০
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
উচ্চশিক্ষিতা পার্শীমহিলা	৭২
এণ্ড্রু কার্ণেগী	২৩২
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৬
কুমারী ফৈজি	২০৮
কুমারী মালবেরী	১৬
কুমারী লুকাস	৮৮
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন	৪০
গঙ্গাবতরণ	১২০
ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারী ত্রয়	১৮৪
দাদাভাই নৌরোজী	১২৯
ধানকোর বাই মাধোদাস	২৩৬
নেপোলিয়ন ও জোসেফাইন	১১২
পার্সিফোনের প্রত্যাবর্ত্তন	১৫২
পুনা বিধবাশ্রমের ছাত্রীগণ	১৮৮
বদরুদ্দীন তায়েবজী	৬৫
মণিকার প্রার্থনা	১৯৩
মাতাজী তপস্বিনী	১
মালতী	২৫০
মেরী ম্যাগডালিন	২২৫
ম্যাট্‌সিনি	৮০
রবিবর্ম্মা	১০৪
রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী	১৬১
শকুন্তলা-পত্রলেখন	১৩৬
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	১৬৮
সান্ত্বনা দেবী	৯৮
সার হেন্‌রী কটন	৩২
সীতা ও মায়ামৃগ	১৪৪

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা।
অপূর্ণ সাধ (কবিতা)	শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী	২৩৫
অদৃষ্ট-লিপি (গল্প)	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	১৮, ৪২, ৮৪
আছ (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৫৩
আদর্শ পুরুষ আনন্দমোহন	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ,	৫২
আরতি অন্তে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৭
আয় ঘুম আয় (ছড়া)	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২২৮
আহ্বান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
আহ্বান (কবিতা)	শ্রীমতী সরলা দত্ত	২০৪
৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	২৫
ঋগ্বেদের দেবতাগণ	শ্রীমতী রাজকুমারী দাস এম, এ,	৩৩, ৬৫, ৯৭, ১২৯, ১৮৭
এমাসের চিত্র	... ...	১২৫, ১৫৩, ১৮৭, ২১৯, ২৫৬
কল্যাণী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এ,	১৪৪
কুমারী মালবেরী	... ...	১৭
কুমারী লুকাস	... ...	৮৮
কোহেবালের কামিনী	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১৪২, ১৮০, ২১০
গার্হস্থ্য কথা	... ...	৩০
গোতমী-গাথা	শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল ; এম, আর, এ, এস,	৭২
ছোট বৌ (গল্প)	প্রবাসিনী	৯৯
জাতীয় সাহিত্য	শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস বি, এ ; ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল	৮৯
জাপানের বালিকাবিদ্যালয়	... ...	১২৪, ১৫১
জীবন-সংগ্রামে নারী	... ...	২৫৫
জোসেফাইন	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত	১১২
তৃষ্ণাতুর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৮৪
ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারীত্রয়	... ...	১৮৫
দানবীর কার্ণেগী	শ্রীমতী প্রীতিবালা	২৩০
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	৩৬
৺ধানকোর বাই মাধোদাস	শ্রীমতী কুমুদিনী গাণ্টি	২৩৬
নব নারী	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১৪৮, ১৮৩, ২০৭, ২৩৩
নুরজাহান (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিংহ	৬, ৫৭, ৯২, ১৫৪, ২১৯, ২৩৯
পরকাল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায়	২৩২
পরিবর্ত্তন (গল্প)	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	১৪৫, ১৭৪, ২০৫
পল্লীমাতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০
পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন	... ...	২৫৬
পুনর্ম্মিলন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল,	২৬
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী	১, ২২৫
প্রেমে সংযম (কবিতা)	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	১০৮
ফ্রেজার গঞ্জ	শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরী	১৪

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা।
বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	১২০
বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি	... ...	১২০
বন্ধের কথা	শ্রীমতী কুমুদিনী গাপ্টি	৬৯
বৈদিক সমাজ-চিত্র	শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ	২৪৬
বৌদ্ধ সাহিত্য	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	১১
ব্রত ধারণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায়	৬৯
ভগ্নিগণের প্রতি নিবেদন	শ্রীমতী বরদার মহারাণী	১৬১
ভক্তি-উচ্ছ্বাস (কবিতা)	শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী	৮০
ভক্তি ও সেবা	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত	৭৪
ভারত-মহিলা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ,	৫১
ভারত-মহিলা-পরিষদ	... ...	১৯১
ভারত-নারীর শিক্ষা	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	২০৩
ভারতে আমীর	... ...	২০১
ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র	প্রবাসিনী	১৩৮, ১৮৬, ১৯৬
মগের মুল্লুক	শ্রীমতী প্রেমকুসুম রাহা	১১১, ১৫২, ২২৯
মঞ্জিরা (পদ্য গল্প)	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক এম, এ ; বি, এল,	২৪৫
মহাত্মা বদরুদ্দীন তায়েবজী	... ...	৯৫
মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত	... ...	২৬
মাতাজী তপস্বিনী	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত	২৯
মৃত্যু	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	১৭৮
মৃত্যু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২০০
ম্যাট্‌সিনি	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত	৬২, ৮১, ১২৫, ১৫৯
রবিবর্ম্মা	... ...	১০৫
রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী	... ...	১৯১
শান্তি (কবিতা)	শ্রীমতী প্রমোদবালা সেন	২১২
শোক-সঙ্গীত	... ...	৮৮
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	... ...	১৬৯
সন্ধ্যা (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনি দাসী	৫
সহানুভূতি	শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী	১৪৯
সাধ্বী নগেন্দ্রবালা	শ্রীমতী হরিপ্রভা মল্লিক	২১৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	... ...	৩১, ৯৫, ১২৭
সুলতানার স্বপ্ন	শ্রীমতী হোসেন	১৩২, ১৬৩
সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার	শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু	২৫২
স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু	১৭০
স্নেহময়ী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল,	৩৬
স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু	শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৪৮
স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	২১৭
স্বদেশী বস্ত্র প্রচারে বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ,	১৯৩
স্মরণীয় দিন (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	১৭২

মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী

শ্রীমতী মাতাজী তপস্বিনী।

(১৯০০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ।)

173

283

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

২য় ভাগ। } ভাদ্র, ১৩১৩। { ১ম সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা।

অতি প্রাচীন কালে এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য মহিলারা কীদৃক্ সুশিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা জানিতে হইলে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্য-নাটকাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। যাঁহারা একদেশদর্শী ও সবিশেষ শাস্ত্রচর্চ্চাবিহীন তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিলেই বিধবা হয়। তাঁহারা একথা বলিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের হৃদয়কন্দর কুসংস্কারান্ধকারজালে সমাচ্ছন্ন। জ্ঞান-সূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ না হইলে সে অন্ধকারজাল ছিন্ন হইবে না। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষের সনাতন বেদোক্ত ধর্ম্মের বিরোধী। তাঁহারা আর্য্যসন্তান বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু আর্য্যাচার্য্যদিগের কার্য্যকলাপের অনুসরণে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের বেদে কি লেখা আছে না আছে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধিৎসাবর্জ্জিত। এদেশে বেদের পঠন-পাঠনপদ্ধতি বিলুপ্ত হওয়াতে এদেশের লোকেরা বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া যে কুসংস্কারাপন্ন হইয়া পড়িবে, ইহা তো স্বাভাবিক। দেশমধ্যে বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনপ্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে যে ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত স্বরসংযোগে বেদাধ্যয়ন-রীতি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও 'যেন কেন প্রকারেণ' আবৃত্তি ও অর্থজ্ঞান মাত্র সম্পাদন করিবার জন্যও যদি দেশের লোকের ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলেও দেশের ঈদৃশ অনিষ্ট ঘটিত না, তাহা হইলে আমাদের স্বদেশীয় লোক জালবদ্ধ মীনের ন্যায় কুসংস্কারজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িত না। পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিলচক্রে লোক যে কিরূপ ঘূর্ণ্যমান হইতেছে তাহা দেখিয়া বিজ্ঞগণ সময়ে সময়ে অশ্রুসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বদেশে কাল-মাহাত্ম্যে অত্যুচ্চ অভ্যুন্নতি-শৈলসমারূঢ় জাতিও অতল-পাতালগর্ভে বিলীন হইয়া যায় ও আম-মাংস ভোজী, তরুত্বক্-পরিধায়ী, ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল-গিরিকন্দরবাসী, ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন বর্ব্বর অসভ্য জাতিও সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণা-প্রসূত তথ্যসম্বাদে আমরা ইহা অবগত হইয়া থাকি।

সুতরাং কবিকুলচূড়ামণি মহাকবি কালিদাস স্বীয় অমূল্য রত্ন 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

অর্থাৎ যে ঔষধি সেবন করিয়া লোক ব্যাধিমুক্ত হয়, যমের হস্ত হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পায়, প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেই ঔষধিসমূহের অধিপতি তমোনাশক, জগৎপ্রকাশক চন্দ্রদেবতাও অস্তমিত হন। চন্দ্রদেব অস্তাচলচূড়াবম্বন করিলে পর সমগ্র জগৎ-প্রকাশক, প্রখরকিরণমালী ভগবান সূর্য্য অত্যুচ্চ আকাশ-মার্গে উদিত হন। আবার সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ঈদৃশ প্রভাবশালী প্রভাকরও অস্তমিত হইয়া যান। এই চন্দ্রসূর্য্যের যুগপৎ উত্থান পতন দেখাইয়া ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিদিন এই শিক্ষা দিতেছেন, যে জগতে সকলেরই উত্থান পতন ঘটিয়া থাকে; সর্ব্বোপরিস্থ চন্দ্রসূর্য্যেরও যখন এরূপ ঘটিয়া থাকে তখন জাতিবিশেষের উত্থান পতনে বিস্মিত হওয়া বৃথা কষ্ট পাওয়া মাত্র।

পুরুষদিগের মধ্যেই যখন বেদাধ্যয়নপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে তখন স্ত্রীলোকের বেদাধ্যয়নবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার আছে কি না এই সংশয়ের উচ্ছেদ করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে এই কথা বলা উচিত বিবেচনা করি, যে পুরুষজাতিই যখন আজ কাল বেদের কোন ধার ধারেন না, তখন স্ত্রীজাতির বেদাধিকার বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য এত মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে, "প্রয়োজন-মনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে।" কোন প্রয়োজন ব্যতি-রেকে কোন মূঢ় ব্যক্তিও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। প্রয়োজন এই, যে কতকগুলি এবম্বিধ লোক আছেন, যাঁহারা নিজেও কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না, অপরে যদি কোন সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও দেখিতে পারেন না, অপরের সৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য নানা-বিধ সমালোচনা করিয়া থাকেন ও জেদ বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ উদ্ভট শাস্ত্র ও তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। তাঁহাদিগের নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণরূপ অঞ্জনশলাকা সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক স্ত্রীলোকের শাস্ত্রাধ্যয়নপ্রথা প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল কি না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইয়া যায়, এইরূপ সংস্কারাপন্ন অনেক মূর্ত্তি এই বিংশতি শতাব্দীতেও বিদ্যমান আছেন। আর্য্যাচার্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্র কিন্তু বলিতেছেন যে, বাপু! ভারতীয় আর্য্যমহিলারা কুমারী অবস্থায়ই শিক্ষা লাভ করিবে। যে কুমারী বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ সে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহা আমার উদ্ভট শাস্ত্র নয়, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মহা-প্রামাণিক "হেমাদ্রি" গ্রন্থ এই কথা বলিতেছেন ঃ—

কুমারীং শিক্ষয়েৎ বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদাপ্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততো বরায় বিদুষে কন্যা দেয়া মনীষিভিঃ।
এষঃ সনাতনঃ পন্থাঃ ঋষিভিঃ পরিগীয়তে॥
অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবানাম্।
নোদ্বহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

কুমারীকে বিদ্যাশিক্ষা দান করা উচিত। কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, 'ধর্ম্ম ও নীতিবিদ্যা শিক্ষা দিবে।' মুরগীর গল্প ও শূকরের উপাখ্যানাদি না পড়াইয়া স্ত্রীধর্ম্মজীবন সংগঠিত করিবার জন্য কুমারীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবে। কুরুচিকর নাটক নভেল ইত্যাদি না পড়াইয়া সুনীতি শিক্ষা প্রদান করিবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি পবিত্রচরিত্রা আর্য্যমহিলা-দেবীদিগের দৃষ্টান্তসমূহ যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে, সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিলে পিতামাতা, শ্বশুরশ্বশ্রু, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি স্ত্রীজাতির কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা কুমারীগণ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে। "দ্বয়োঃ

কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি।" যে কুমারী বিদ্যালাভ করে সে উভয় কুলের কল্যাণদায়িনী হয়। কেবল গোয়ালা ও ধোপার খাতা লিখিবার জন্য বা প্রোষিত স্বামীসকাশে প্রেমপত্র লিখিবার জন্য স্ত্রীলোকগণকে বিদ্যা শিখাইতে শাস্ত্র কখনও অনুমোদন করেন না। তার পর যখন ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে কুমারী সুশিক্ষিতা হইবে তখন তাহাকে এক বিদ্বান বরের হস্তে সমর্পণ করিবে। ধর্ম্মনীতিশিক্ষিতা কুমারীকে মূর্খ বরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। আচার-বিনয়-বিদ্যাবিহীন একটী আধুনিক কুলীনকে পঞ্চসহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া কন্যার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিবে না, ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। ইহা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তক বক্তৃতাবাগীশদিগের কথা নহে, "এষঃ সনাতনঃ পন্থাঃ ঋষিভিঃ পরিগীয়তে।" ইহা অতি প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের পথ। এই পথ প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ অনুসরণ করিয়াছেন। এই প্রশস্ত পথের গৌরব উচ্চরবে প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক দুন্দুভিনাদে ঘোষিত হইয়াছে। যে কুমারী পতি কিরূপ বস্তু তাহা জানে না, অর্থাৎ পতির মর্য্যাদা জানে না, পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা জানে না, পতিসেবা কিরূপে করিতে হয় তাহা জানে না, ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ শাসনবাক্য সকল লিখিত আছে তাহা জানে না, এইরূপ কুমারী কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কখনই উচিত কার্য্য নহে। সীতা সূর্য্যবংশোদ্ভব উচ্চ রাজ-শ্বশুরকুলের উচ্চ প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, উত্তমোত্তম সর্ব্ববিধ চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়, অসংখ্য দাসদাসী ও অন্যান্য পরিজন, স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকা-দোলা ও হস্তীরথাদি যানবাহন এবং অন্যান্য সুখোপভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পতিদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অতি ভীষণ বন্যজন্তুসমাকীর্ণ, কণ্টকাচ্ছন্ন খাদ্যপেয়াদিবর্জ্জিত মহারণ্যমধ্যে গমন করিয়া সযত্নে পতিসেবা করিয়াছিলেন। পতিবিহীন শ্বশুরকুলে তাঁহার অনাদর ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে তিনি পিতৃদেব মহারাজ জনকের মিথিলা-রাজধানীস্থ প্রাসাদে অনায়াসেই যাইতে পারিতেন। সেখানে তাঁহার আদরের সীমা থাকিত না। মহারাজ জনক অতি যত্নসহকারে মহাসমাদরের সহিত স্বীয় কন্যা সীতা দেবীকে পালন করিতে পারিতেন। এই মহাসুখকর উভয় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পতির সুখে সুখিনী ও পতির দুঃখে দুঃখিনী হইবার জন্য তিনি পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই সকল পতিপত্নী-চরিত্রসমন্বিত পুণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষাদান না করিয়া পিতা যেন কুমারী কন্যার বিবাহ না দেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার এই কথা অতি স্পষ্ট উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

"মহানির্ব্বাণতন্ত্র" বলিতেছেন ঃ—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥" কন্যাকে যেমন লালনপালন করিবে তদ্রূপ অতি যত্নসহকারে তাহাকে শিক্ষা দান করিবে, অনন্তর বিদ্বান পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে। পাত্রী যদি বিদুষী হয় আর পাত্র যদি বিদ্বান না হয়, তাহা হইলে উভয়ের মনের মিল হয় না, সংসারে শান্তিসুখ অনুভব হয় না, সুতরাং বিদুষী পাত্রীকে বিদ্বান বরের করে সমর্পণ করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে ভারতীয় আর্য্যমহিলারা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ-লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রসকল যত্নসহকারে পাঠ করিতেন এবং ঐ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত 'মালতী মাধবের' দ্বিতীয় অঙ্কে কামন্দকী বলিতেছেন ঃ—"ইতরেতরানুরাগোহি দারকর্ম্মণি পরার্ধ্যং মঙ্গলং গীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা, যস্যাং বাঙ্মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধ স্তস্যাং সমৃদ্ধিরিতি।"—বিবাহকার্য্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগই ভাবী মহামঙ্গলসূচক পদার্থ। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যে নারী বাক্য, মন ও চক্ষুদ্বারা বরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন তিনি অতি সৌভাগ্যবতী নারী। কামন্দকী প্রভৃতি আর্য্য মহিলারা আধুনিক অনেক পণ্ডিতের ন্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যাদি-সঙ্কলিত সংগ্রহ-গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত করিতেন না; কিন্তু প্রাচীন মহর্ষিদিগের মূল গ্রন্থও যথাবিধি পাঠ করিতেন, আলোচনা করিতেন, স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন; প্রমাণপ্রদর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ মহর্ষিবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন।

কামন্দকীকর্তৃক মহর্ষি অঙ্গিরার এবম্বিধ প্রমাণ-

বচন উদ্ধৃত করাতে আরো একটু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগৃহীত হইতেছে এই, যে ইদানীং হিন্দু-মুশলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির মধ্যে যেমন পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে দেখা যায় পূর্ব্বকালে এক ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর তাদৃশ বিবাদ-আক্রোশাদি সংঘটিত হইত না, বরং যে ধর্ম্মশাস্ত্রে উত্তম উত্তম সর্ব্ববাদি-সম্মত লোকহিতকর কথা লিখিত আছে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ঐ সকল অমূল্য রত্নোপদেশ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। প্রমাণস্বরূপে ঐ সকল বাক্য শিরোধার্য্য করিতেন। কামন্দকী বৌদ্ধপরিব্রাজিকা ছিলেন। তিনি নিজের বাক্যের প্রমাণ সংস্থাপনের জন্য মহর্ষি অঙ্গিরাপ্রণীত ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন আশ্রয় করিয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব যদি কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়াও যায় তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, যে অন্ততঃ মহাকবি ভবভূতির সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরভাব ছিল না।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র এক গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মাবতী নগরীর রাজমন্ত্রী ভূরিবসু ও বিদর্ভ রাজমন্ত্রী দেবরাত উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু কামন্দকী, সৌদামিনী প্রভৃতি বৌদ্ধ মহিলাগণের সহিত একত্র এক অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কামন্দকী লবঙ্গিকা নাম্নী প্রিয় সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—"অয়ি! কিং ন বেৎসি, যদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্তবাসিনাং সাহচর্য্যমাসীৎ। তদৈব চ অস্মৎসৌদামিনীসমক্ষং অনয়োর্ভূরিবসুদেবরাতয়োর্বৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞা অবশ্যমাবাভ্যামপত্য সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্য ইতি।"—অয়ি প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তুমি কি জান না, তোমার কি মনে হইতেছে না, যে গুরুর নিকট একত্র বিদ্যাধ্যয়ন সময়ে নানা দিগ্দেশবাসী ছাত্রগণের সহিত আমাদের একত্র সাহচর্য্য হইত?* সেই সময়ে আমাদের সৌদামিনীর সমক্ষে ভূরিবসু ও দেবরাত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা একের পুত্রের সহিত অপরের কন্যার পরিণয় সম্পাদন করাইবেন। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রগণের সহিত দুই একটী ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছিল বলিয়া হুজুকপ্রিয় কতকগুলি লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি প্রাচীনকালের এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত থাকিতেন তাহা হইলে পরচর্চ্চায় বৃথা কালাতিপাত করিয়া নিজের কায ভুলিতেন না।

ব্যাসবাল্মিকী, কপিলপতঞ্জলি, গোতমকণাদ প্রভৃতি মহর্ষিরা যে নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোচনায় কালাতিপাত করিয়া অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মানবকুলের হৃদয়কন্দরে জ্ঞানরশ্মিজাল বিস্তার করিতে কতই প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এবং অধুনা মোক্ষমুলর, রিজ্‌ডেবিড্‌স্‌, চাইল্ডার্স্‌, আলউইস্‌, ওল্ডেন-

---

* অতি প্রাচীনকালে গুরুগৃহে পুরুষ ও স্ত্রী-বিদ্যার্থী যে এক সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, ভবভূতিপ্রণীত "উত্তর রামচরিতে"ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী নাম্নী বিদ্যার্থিনীকে বনদেবতা যখন তাঁহার দণ্ডকারণ্যে প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আত্রেয়ী উত্তর করিলেন :—

অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্ত বিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥

"এই দণ্ডকারণ্য প্রদেশে অগস্ত্য প্রভৃতি বহু উদ্গীথবিদ্ (উদ্গীথ অর্থাৎ সামবেদের অংশ বিশেষ) পণ্ডিত বাস করেন, তাঁহাদের নিকট বেদান্তবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মহর্ষি বাল্মীকির নিকট হইতে আমি এখানে আসিয়াছি।"

বনদেবতা বলিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি বেদশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এই দীর্ঘপ্রবাসে আসিবার কারণ কি?

আত্রেয়ী উত্তর করিলেন—"সেখানে মহান্ অধ্যয়নবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির দুইটী অত্যদ্ভুত শক্তিশালী ছাত্র জুটিয়াছে, অতিপ্রজ্ঞাসম্পন্ন সেই ছাত্রদ্বয়ের সহিত (সাধারণ বুদ্ধিশালিনী) আমার একত্র সহাধ্যয়ন ঘটিয়া উঠিতেছে না। কারণ গুরু যদিও তীক্ষ্ণমেধা এবং অল্পমেধা ছাত্রকে একই ভাবে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন, তথাপি উভয়ে সমানভাবে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে না।" এস্থলে আত্রেয়ী সহাধ্যায়ী প্রতিভাশালী সহপাঠীদ্বয়ের (কুশলব) সঙ্গে সমান দ্রুতগতিতে পাঠ শিক্ষা করিতে না পারিয়া বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করতঃ বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য গুরুর অন্বেষণে অতি দূরপ্রবাসে গমন করিতেছেন। প্রাচীনকালে স্ত্রীপুরুষের একত্র অধ্যয়ন ও নারীর জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহার ইহা অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাঃ মঃ সঃ।

বার্গ, পলকেরস্ প্রভৃতি বিদ্বদ্বর্গ যে নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোচনায় মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন, সেই নির্ব্বাণতত্ত্ব একদা ভারতীয় আর্য্যমহিলাদিগেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। মালতীমাধব নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মালতী বলিতেছেন :—"কেন উন উবাএন সম্পদং মরণনিব্বানস্স অন্তরং সম্ভাবইস্সম্।"—কি উপায়ে সম্প্রতি মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্য অবগত হইব?—যদি মরণ ও নির্ব্বাণ একই পদার্থ হইত তাহা হইলে মালতীর হৃদয়ে মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্যাবগতির ইচ্ছা উদিত হইত না। মরণ ও নির্ব্বাণ এক পদার্থ নয়, তাই মালতী এই উভয়ের পার্থক্যাবগতির জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। কামন্দকীর অন্তেবাসিনী সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তার পর অঘোরঘণ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্রমন্ত্র, যোগ-অভিযোগাদি অনুষ্ঠানদ্বারা আলৌকিক সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মালতীমাধবের দশম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কামন্দকী স্বীয় শিষ্যা সৌদামিনীকে বলিতেছেন :—

বন্দ্যা ত্বমেব জগতঃ স্পৃহনীয় সিদ্ধিঃ
এবম্বিধৈর্ব্বিলসিতৈ রতি বোধিসত্ত্বৈঃ।
যস্যাঃ পুরা পরিচয় প্রতিবদ্ধবীজ
মুদ্ভূতভূরিফলশালি বিজৃম্ভিতং তে॥

হে কল্যাণি, তুমিই সমগ্র জগতের বন্দনীয়া, কারণ তুমি যে অলৌকিক তপঃসিদ্ধিলাভ করিয়াছ তাহা অতি স্পৃহনীয় বস্তু ও বোধিসত্ত্বগণেরও দুর্ল্লভ। তুমি জ্ঞানী বোধিসত্ত্বগণকেও অতিক্রম করিয়া বহুবিধ বিভূতি লাভ করিয়াছ; অতএব তুমিই সকলের পূজনীয়া।

মহাভারতের বনপর্ব্বে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন :—"অত্র শর্ম্মাশিবানামব্রাহ্মণী বেদপারগা।"—এই আশ্রমে শিবা নাম্নী এক বেদপারগা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে, যে সুলভা নাম্নী এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যা একদা মহারাজ জনকের পণ্ডিতমণ্ডলীসমলঙ্কৃত সভায় উপস্থিত হইলে জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' তিনি উত্তর করিলেন :—

"সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতি মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্॥"

আমি সেই উচ্চ রাজন্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরিসমাপ্তির পর আমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও মেধাদি সদ্গুণসম্পন্ন পতি না পাওয়াতে আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক কৈবল্যপ্রাপ্তি ব্রতে দীক্ষিত হইয়া একাকিনী মুনিধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। এই আর্য্যললনাললামভূতা সুলভা মহারাজ জনককে অনেক সূক্ষ্ম ভগবত্তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে, ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবের ন্যায় আজন্ম-তত্ত্বজ্ঞানীদিগেরও গুরু মহারাজ জনকও একটী আর্য্যমহিলার নিকট গভীর ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বিনী সুলভা নির্ব্বাণ-মোক্ষতত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। মহারাজ জনক স্বয়ং এক জন জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সভা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাজ্ঞানী মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সদাই সমলঙ্কৃত থাকিত। সেখানে সাধারণ পল্লবগ্রাহী ব্যক্তি পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিত না; কোন এক শাস্ত্রে অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তা না থাকিলে কেহ রাজসমীপে আসনই পাইতেন না। সেইরূপ সভায় তাদৃশ মহারাজের সহিত এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরপ্রত্যুত্তর করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বদ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যমহিলাদেবীগণ শিক্ষাদীক্ষায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী।

সন্ধ্যা।

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি দীপ্ত শিরোপরে,
ঐ আসিছেন সন্ধ্যা শ্রান্তি নাশ তরে,
—প্রসারিয়া দুই কর 'স্থিরোভব' বলি।
উত্থিত গগনপথে বিহগ-কাকলী,
প্লাপিত শঙ্খের ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে,
ধ্বনিতেছে দিক্‌বিদিক্ উদাত্ত গম্ভীরে,

সন্ধ্যারতা পুরাঙ্গনা দীপ লয়ে করে ;
ঘন বটবীথি মাঝে ত্বরিতচরণা
চকিত-সভীত-মতি কৃষক অঙ্গনা
ফিরিতেছে গৃহমুখে কুম্ভে ভরি জল,
চলকে কলসে বারি ছলাৎ চলল্ !

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী।

নুরজাহান।*

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কান্দাহার হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ অতি দুর্গম। তৃণপাদপবিরহিত দুরারোহ পর্ব্বতমালার উপর দিয়া বিরল-মানব-সমাগমচিহ্নিত একটী রেখাপথ অবলম্বন করিয়া অতি ক্লেশে যাত্রীদিগকে বহু সহস্র মাইল অতিক্রম করিতে হয়। এই সংকীর্ণ পথটী কদাচিৎ দ্রাক্ষা-আখরোট ও খরমুজ-তরমুজলতাশোভিত সুন্দর অধিত্যকাপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু প্রধানতঃ ইহা মনুষ্যাবাসবর্জ্জিত পর্ব্বতশ্রেণী, ভগ্ন পর্ব্বতশিখর ও চিরনীরব ভীষণ অন্ধকারময় পর্ব্বতগুহার মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। পরিত্যক্ত অট্টালিকার ভগ্ন সোপানশ্রেণীর ন্যায় ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই পদনিক্ষেপ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বসন্তকালে একটী পুরুষ ও একটী গবারূঢ়া রমণী ধীরে ধীরে এই কঠিন শৈলপথে গমন করিতেছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁহারা এই দুর্গম পথের প্রায় তিন সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়াছেন ; কিন্তু সম্মুখে ভীষণ গহ্বরপরিপূর্ণ দুরতিক্রম্য গিরিসঙ্কট। পুরুষটী একবার ফিরিয়া ঊর্দ্ধে শান্ত নীল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আবার অসহায়ের ন্যায় নিরাশদৃষ্টিতে সম্মুখস্থিত জনমানবশূন্য সুদীর্ঘ পথের দিকে চাহিলেন ; তার পর রমণী-আরোহিত গাভীটাকে দ্রুতবেগে চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পুরুষটীর আকৃতি সুদীর্ঘ বা সুন্দর নহে, কিন্তু তাহা মহত্ত্বব্যঞ্জক ও পৌরুষপূর্ণ। কঠোর দারিদ্র্য তাঁহার বিশাল ললাটে অভাবের গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সংহত বদনমণ্ডল হইতে মহত্ত্বের প্রভা ও দৃঢ়চিত্ততার ভাব অথবা অঙ্গারকৃষ্ণ নয়নযুগল হইতে তাঁহার অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য কিছুমাত্র অপনীত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার মুখমণ্ডল সূর্য্যোত্তাপদগ্ধ হইলেও কৃষ্ণবর্ণ নহে, লম্বমান অর্দ্ধপক্ক সুদীর্ঘ কেশরাশি তাঁহার সুবিস্তৃত স্কন্ধদেশ আচ্ছাদন করিয়াছে। তাঁহার অপরিচ্ছন্ন বেশভূষার মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকৃতির উন্নত ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সঙ্গীয় রমণী তাঁহার পত্নী। তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাঁহার সুগৌর অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা যেন সুনিপুণ ভাস্করের দ্বারা কুন্দিত। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ বিকশিত গোলাপের ন্যায় মাধুর্য্যময়, কিন্তু আপাততঃ সেই সৌন্দর্য্য যেন কিঞ্চিৎ মলিনতাগ্রস্ত। একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর অতিক্রম করিবার সময় সাহায্যের জন্য তিনি স্বামীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, মোস্‌লেম-ললনাসুলভ বাধ্যতা ও পতিপ্রেমে তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বীয় যাতনা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়া মৃদু কম্পিতস্বরে তিনি স্বামীকে বলিলেন ঃ—"স্বামিন্, আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আসনে স্থির হইয়া বসিবার পর্য্যন্ত আর সামর্থ্য নাই।"

পুরুষটী বলিলেন ঃ—"প্রিয়ে, কোন প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে আর একটু চল। ঐ দেখ দূরে সুন্দর অধিত্যকায় ফলভরে অবনত দ্রাক্ষালতা সকল দেখা যাইতেছে, বক্রাকারে ঐ দেখ সুন্দর নদী প্রবাহিত হইতেছে ; নিশ্চয়ই সেখানে গ্রাম আছে, সেখানে একটু আশ্রয় আমরা অবশ্যই পাইব।"

অতি কাতরকণ্ঠে রমণী বলিলেন ঃ—"না, আমি আর পারি না। তুমি জান নাথ, তোমার মুখে একটু উদ্বেগের আভাস দেখা অপেক্ষা কত দুঃসহ ক্লেশ আমি অকাতরে

---

* এই উৎকৃষ্ট উপন্যাসখানি শ্রীযুক্ত মালবারি সম্পাদিত "ঈষ্ট ও ওয়েষ্ট" নামক ইংরেজী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ভারত-মহিলায় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন ভাঃ মঃ সঃ।

সহিতে পারি। কিন্তু এই অসহ্য ব্যথা আমার সকল চেষ্টা, সকল সংযম পরাস্ত করিয়াছে। এখন একটী অনুগ্রহ কর। নিম্নে ঐ অধিত্যকাপ্রদেশে যাও, কোন সাহায্য পাও কিনা দেখ। যদি পার, রাত্রেই ফিরিয়া আসিও, না পারিলে কাল আসিও, যদি জীবিত থাকি ভাল, নতুবা এই শেষ বিদায়। এখন তুমি শীঘ্র যাও।" কাতরকণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন, কিন্তু যাতনাক্লিষ্ট শ্রান্ত দেহ আর সহিতে পারিল না। বিপন্ন স্বামীর উদ্বেগবৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি বহুক্ষণ স্বীয় ব্যথা গোপন রাখিয়াছিলেন; শান্ত ও সংযত ভাবে কথা কহিবার এই চেষ্টায় অবশিষ্ট শক্তিটুকুও যেন চলিয়া গেল, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, কিন্তু গাভীপৃষ্ঠ হইতে পড়িতে পড়িতে স্বামী বাহুবেষ্টনে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। গীয়াসবেগ কাতরস্বরে বলিলেন, (পুরুষটীর নাম গীয়াসবেগ)—"হায়, ইঁহাকে পরিত্যাগ করিব? এ জগতে তবে আমার আর জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? দুঃখের অন্ধকারময় দিনে যাঁহার প্রেম এই জীবনকে আলোকিত করিয়াছে, সেই একজনকে হারাইয়া শুধু নিজের জন্য সংসারে বাঁচিয়া থাকিব?" ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তিনি পত্নীকে একটী বৃক্ষের ছায়ায় শুষ্ক পত্র ও কোমল তৃণের উপর শয়ন করাইলেন। নিকটে একটী ঝরণা হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া অল্প অল্প জল পড়িতেছিল, অঞ্জলি করিয়া তিনি সেখান হইতে জল আনিয়া পত্নীর মুখে চোখে ছিটাইয়া দিলেন ও তাঁহার শুষ্ক অধরোষ্ঠ জলসিঞ্চিত করিলেন। তার পর তাঁহার পদতলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে যত প্রেমপূর্ণ সুমিষ্ট নামে পত্নীকে সম্বোধন করিয়াছেন সেই সকল নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া না যাইতে ব্যাকুল-হৃদয়ে অনুনয় করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ তাঁহার প্রেম-পূর্ণ আহ্বানের কোন উত্তরই পাইলেন না। তিনি তাঁহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন, আদর করিতে লাগিলেন, আর একটীবার কথা কহিতে কাতরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মস্তকে বাতাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার কাতরতাপূর্ণ এই যত্ন দেখিয়া পাষাণ হৃদয়ও বুঝি গলিয়া যাইত।

অবশেষে রমণী নয়ন অর্দ্ধোন্মীলিত করিলেন দেখিয়া গীয়াসবেগের মুখ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পত্নীর গভীর যাতনাব্যঞ্জক কাতর-ধ্বনি শুনিয়া আবার তিনি নিতান্ত ম্লান হইয়া পড়িলেন। তিনি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রিয়তমে! তুমি এখন কেমন আছ? একটু ভাল বোধ হইতেছে কি?" মুহূর্ত্ত কাল যাতনা বিস্মৃত হইয়া রমণী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি এখন একটু ভাল আছি।" সুমিষ্ট দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ব্যথা ফিরিয়া আসিল। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল কঠোর ব্যথায় অস্থির হইয়া তিনি ঘাসের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, কিছুতেই সেই বেদনার উপশম হইল না, তাঁহার সমগ্র অস্তিত্ব যেন সেই ব্যথায় জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িল। বিপন্ন গীয়াসবেগ কখনো পত্নীর এ পাশে, কখনো ও পাশে যাইয়া বসিতে লাগি-লেন, কখনো পদতলে কখনো বা পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কখনো তাঁহাকে ধরিয়া বসাইতে লাগিলেন, কখনো তাঁহার কপোলে চুম্বন করিতে লাগিলেন,—তিনি বুঝি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার গভীর প্রেমচুম্বনে পত্নীর ব্যথার লাঘব হইবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাবা মন্দিরের দিকে ফিরিয়া নতজানু হইয়া বিপন্নের আশ্রয় ঈশ্বরের নিকট পত্নীর জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সমগ্র মনপ্রাণ যেন তিনি সেই প্রার্থনায় ঢালিয়া দিলেন।

প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি যখন পত্নীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন ব্যথাবিমুক্ত পত্নী তাঁহার যন্ত্রণার ফলস্বরূপ নবজাত শিশু ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনন্দে মৃদু হাস্য করিতেছেন। গীয়াসবেগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বংশপরাম্পরাক্রমে যুগ যুগ ধরিয়া যাঁহার কাহিনী মানবজাতির স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে, এই সন্ধ্যাকালে সেই নুরজাহান ভীষণ অরণ্যময় এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন দরিদ্রতার মধ্যে জন্মগ্রহণ

করিলেন। গীয়াসবেগ আনন্দে যেন উন্মত্তপ্রায় হইলেন, দৌড়িয়া তিনি আবার ঝরণা হইতে একটু জল আনিয়া পত্নীর শুষ্ক অধরোষ্ঠে সিঞ্চন করিলেন। কিন্তু সেই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীতিপ্রদ কেমন এক প্রকার পাণ্ডুর আলোক বিকীর্ণ করিয়া সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন দেখিয়া গীয়াসবেগের অন্তরাত্মা সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। উদ্বেগে তাঁহার বদন আবার মলিন হইল; তিনি একান্ত আকুলভাবে পত্নীর দিকে চাহিলেন; সমগ্র মনপ্রাণের সহিত তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পত্নীকে গাভীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এক হস্তে তিনি তাঁহাকে ধরিলেন এবং অপর হস্তে শিশুকে ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রমণীর আর বসিবার সামর্থ্য ছিল না, তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। হতবুদ্ধি গীয়াসবেগ ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, উদ্বেগে ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল। তাঁহার অন্তরে 'কর্ত্তব্য' ও 'প্রয়োজন' এতদুভয়ে এক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; অবশেষে 'প্রয়োজন' জয়লাভ করিল। তিনি পথিমধ্যে সেই নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার ও পত্নীর জীবন রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। আপনার একমাত্র অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা শিশুকে আবৃত করতঃ তিনি তাহাকে পথিপার্শ্বস্থিত এক বৃক্ষতলে রাখিয়া দিলেন, শিশু যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। গীয়াসবেগ দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলেন, আবার পত্নীকে গাভীপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

স্বামীর দিকে চাহিয়া দুর্ব্বল মৃদু স্বরে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিশু কোথায়?"

গীয়াসবেগ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং কি প্রকার একটা অমানুষিক কাণ্ড করিলেন তাহা ভাবিয়া দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করতঃ পত্নীকে কি উত্তর দিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেনঃ—"প্রিয়তমে, তোমার অবস্থা ভাল নয়, চল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হই।" তাঁহার পত্নী তখন স্বীয় পাণ্ডুর হস্ত সস্নেহে স্বামীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ওঃ, তুমি কত ক্লান্ত হইয়াছ!" কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকিত ভাবে স্বামীর স্কন্ধ হইতে হাত সরাইয়া লইলেন, এবং ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! আমার মেয়ে কোথায়, তুমি তাহাকে কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছ?" অর্দ্ধস্ফুটস্বরে গীয়াস উত্তর করিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না।" রমণী সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, আমার মেয়ে কোথায়, আমার মেয়ে কোথায়, তুমি আমার বাছাকে কোথায় ফেলে এসেছ!" গীয়াসের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, হৃদয়ের গভীর যাতনা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার স্বামী কি এই পাহাড়ে পড়িয়া মরিবে?" সকাতরে ক্রন্দন করিতে করিতে রমণী বলিলেন, "তুমি আমার বাছাকে শীঘ্র নিয়ে এস।" এই কথা বলিয়া তিনি নিজেই গাভীটীকে পশ্চাতে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। গীয়াস সস্নেহে আবার তাঁহাকে ঘাসের উপর শয়ন করাইলেন; যখন তাঁহার চেতনা হইল, লজ্জায় গীয়াস অধোবদন হইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি কাতর হইও না, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আমি এখনই গিয়া তোমার মেয়ে আনিতেছি, যদি মরি সকলে একসঙ্গেই মরিব, আল্লা মহান্!"

কোমল স্বরে রমণী উত্তর করিলেন, "স্বামিন্, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি জানি, তুমি এত কঠোরহৃদয় হইতে পার না। তোমায় এত কঠিন কথা বলিয়াছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" আর কোনও উত্তর না করিয়া ক্লান্তদেহে গীয়াস ফিরিয়া চলিলেন। শিশুর নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ভীষণ কৃষ্ণসর্প ফণা বিস্তার করিয়া নবজাত শিশুর বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। গীয়াস সবেগে সর্পকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন সর্প হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; আনন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি শিশুকে কোলে করিয়া তাঁহার পত্নীর নিকট লইয়া গেলেন। জননী কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুহাস্যে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

গীয়াসবেগ আবার নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট

প্রার্থনা করিলেন, শিশুকে পরিত্যাগ করিবার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার মনে এক নির্ব্বিকার পরম শান্তির উদয় হইল। সেই মুহূর্ত্তেই গীয়াসবেগের দৃষ্টি সূর্য্যের শেষ কিরণরেখার প্রতি পতিত হইল। সেই জনমানবশূন্য ভীষণ পার্ব্বত্য প্রদেশ সান্ধ্য রবির রক্তিম কিরণে অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছে। অবসন্নদেহে অসহায় গীয়াস গভীর নিরাশার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হায়! যদি নিকটবর্ত্তী পান্থনিবাসে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কোনরূপ একটা যান পাইতাম!"

পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল, "তুমি অবশ্য যান পাইবে। যে ঈশ্বর তোমার শিশুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন।"

গীয়াসবেগ ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে উষ্ট্রারোহণে এক দীর্ঘকায় সুন্দর সম্ভ্রান্তবেশধারী পুরুষ। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারেও তাঁহার উষ্ট্রের সুবর্ণমণ্ডিত সজ্জা ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। দৈবকৃপার চিন্তায় গীয়াসের মন তখন পূর্ণ ছিল, সেই দীর্ঘশ্মশ্রু আগন্তককে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, ঈশ্বর বুঝি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্বর্গীয় দূত 'খিজেরকে' পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গীয়াস বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে-ই হউন না কেন, আপনার আগমনে আমার হৃদয় আশায় পূর্ণ হইয়াছে; হয়তো এযাত্রা আমরা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইব।" আগন্তুক উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিলেন এবং গীয়াসের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমার নাম মালেক মসুদ, আমি এই পথযাত্রী এক বণিকদলের নেতা। যাত্রীদলকে পশ্চাতে রাখিয়া আমি অগ্রে চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং তোমরা যে পথে আসিতেছিলে তাহার অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলাম। তোমার স্ত্রীর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার যাতনা এবং তোমার অসহায় অবস্থার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মুহূর্ত্তেই তোমার নিকটে আসা আমার উচিত ছিল, কিন্তু সেই অবস্থায় নিকটবর্ত্তী হইতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করিল, আমি তাহার জন্মমুহূর্ত্ত লিখিয়া লইয়াছিলাম। জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। তোমার নবজাত শিশু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তখনই আমি তাহার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। গণনায় আমার মন এতই নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যে আমি তোমাদের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তোমরা কখন্ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছ, কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমার পশ্চাদ্গামীরা নিকটে আসিয়া উপস্থিত না হইলে আমি হয়তো এখনও সেখানে কোষ্ঠী গণনায় নিযুক্ত থাকিতাম। বন্ধুগণ, তোমরা আর ব্যস্ত হইও না, তোমাদের সকল বন্দোবস্তের ভার আমি লইলাম। কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে, এখন তাড়াতাড়ি পথ চলিতে হইবে। আমার উষ্ট্রের দুই পার্শ্বে দোলায়মান আসনে তোমরা স্বামীস্ত্রী আরোহণ কর, সাবধান, পর্ব্বতগাত্রে আঘাত লাগিয়া যেন পড়িয়া যাইও না।"

গীয়াসবেগ আবার প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন এবং মালেক মসুদকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। কন্যাসহ পত্নীকে উষ্ট্রের একপার্শ্বের আসনে বসাইয়া তিনি স্বয়ং অপর পার্শ্বে বসিলেন। অসময়ে এই সাহায্যের জন্য মালেককে তিনি আবার অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন।

মালেক বলিলেন, "আমি বিপদে পড়িলে তুমি যাহা করিতে আমিও তাহাই করিয়াছি, ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন। তুমি বোধহয় আমার স্বদেশবাসী—আফগান?"

গীয়াস। "না, মহাশয়।"

মালেক। "তোমার আকৃতি-প্রকৃতি অতি সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায়। এই ভীষণ পথে তোমরা একাকী কেন ভ্রমণ করিতেছ জানিতে পারি কি?"

গীয়াস অবনত বদনে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, ভদ্র-বংশে আমার জন্ম; আমার জীবনের সমুদয় দুঃখের কাহিনী শুনিলে আপনি আমাকে নিতান্তই কৃপাপাত্র মনে করিবেন। আমার পিতা সুবিখ্যাত খোজা মহম্মদ সরিফ পারস্যরাজ সাহ মহম্মদ খাঁ তক্‌লুর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সাহ মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তিনি রাজা তেমসের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর

আমি পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার পিতার অসংখ্য শত্রু ছিল, রাজা অতি দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা দুষ্টপ্রকৃতি নিন্দুক-দিগের কুমন্ত্রণা শুনিয়া চলিতেন। রাজা দৃঢ় থাকিলে আমি শত্রুদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিতাম, কিন্তু তিনি আমার কোন কথায়ই কর্ণপাত করিতেন না। অবশেষে শত্রুগণ আমার প্রাণবধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু কালক্রমে তাহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল, তথাপি রাজা তাহার কিছুই প্রতিকার করিলেন না। স্বকীয় পদ ও দুর্ব্বলচিত্ত প্রভুর প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া আমি অবশেষে পারস্য পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলাম; এক অন্ধকার রজনীতে কয়েকজনমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া রাজধানী তেহরাণ নগরী পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পারস্য রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবামাত্র একদল আফগান দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। এই গাভীটী ব্যতীত আমাদের উভয়ের আর কোন সম্বলই রহিল না।"

মালেক। আপনি সুবিখ্যাত পারস্য রাজমন্ত্রী খোজা মহম্মদ সরিফের পুত্র? আপনার আজ এই দুর্দ্দশা? নিয়তির গতি কি বিচিত্র! এখন আপনারা কোথায় যাইবেন মনে করিতেছেন? এই অঞ্চলে কি আপনাদের কোন আত্মীয়বন্ধু আছেন?

গীয়াস। "না মহাশয়, আমার কোন বন্ধু নাই। আমি এখন মহানুভব ভারতসম্রাট আকবরের নিকট যাই-তেছি। শের সাহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সম্রাট হুমায়ুন যখন তেহরাণে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন আমার পিতার প্রতি সেই বিপন্ন রাজঅতিথির পরিচর্য্যার ভার অর্পিত হয়। হুমায়ুন আমার পিতার আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে এক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন। কখনও সুযোগ উপস্থিত হইলে পিতৃদেবকে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিবেন একথাও ঐ পত্রে লিখিত ছিল। আমার পিতার সৎকার্য্যের অনুরোধে সম্রাট আকবর অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, এই আশায় আমি তাঁহার নিকট চলিয়াছি।

মালেক। নিশ্চয়ই সেই দুনিয়ার মালিক সাহান্‌সাহ বাদসাহ বাহাদুর আপনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। আমার প্রতি দিল্লীশ্বরের যথেষ্ট অনুগ্রহদৃষ্টি আছে, আমি আপনাকে সেই মহান্ সম্রাটের নিকট লইয়া যাইব।

মস্তক অবনত করিয়া গীয়াসবেগ মালেককে সেলাম করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ পরে আত্মসংযম করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি আজ যে কাজ করিলেন, পরম দয়ালু ভগবান তাহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না।"

মালেক মসুদ ঝুলি হইতে কয়েকখানা পুস্তক ও একটী সুকৌশলনির্ম্মিত দীপাধার বাহির করিলেন এবং সেই দীপের আলোকে পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিলেন। বাহি-রের প্রবল বাতাসেও সেই দীপ নির্ব্বাপিত হইল না। গীয়াসকে তিনি বলিলেন, "আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার কন্যার কোষ্ঠী এখনও শেষ করি নাই, গণনার মধ্যভাগে আমার সঙ্গীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আপনার কন্যা অতি অপূর্ব্ব অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার 'পোষ্টিনের' (চর্ম্মনির্ম্মিত জামা) পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কয়েকখানা অতি জীর্ণ পুরাতন পুস্তকের সঙ্গে মিলাইতে লাগিলেন। কাগজের উপর কয়েকটী জ্যামি-তিক চিত্র অঙ্কিত করিলেন এবং গণনা শেষ করতঃ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন্। এই বালিকা ভবিষ্যতে রাজরাণী হইবে, শক্তিশালী জাতিসমূহ এবং বহু যুদ্ধ ও যোদ্ধার নিয়ন্ত্রী হইবে।" গীয়াস বিস্মিতনেত্রে মালেকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মালেক বলিলেন, "আমার গণনায় বোধ হয় আপনি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না? আমি তাহার জন্মের প্রকৃত ক্ষণ অবগত আছি, আমার গণনায় ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

গীয়াস বলিলেন, "মহাশয়, আপনার প্রকৃতি অতি দয়ালু, আমাকে আশ্বাস দিবার জন্য আপনি এই সকল কথা বলিতেছেন; জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস

নাই, আমার পিতা জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন, আমার প্রতি গ্রহগণের অনুকূল দৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া কতবার তিনি আমার মহাসৌভাগ্যের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, কিন্তু এই দেখুন, গৃহহীন কপর্দ্দকশূন্য ভিখারীর ন্যায় আজ আমি পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি।"

মালেক মস্থদ তখনও গণনায় ব্যস্ত ছিলেন, গীয়াসের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তিনি বলিলেন, "ইহার কোষ্ঠীতে শুক্র তুঙ্গী রহিয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু শনি প্রতিকূলে। ইহার জীবনে শনির ক্ষণস্থায়ী প্রভাব দেখা যাইতেছে। এই ক্ষণিক অমঙ্গল ছাড়া ইহার জীবন শান্তি, সম্মান ও সৌভাগ্যে পূর্ণ হইবে দেখিতেছি। প্রথম জীবনে দুর্ভাগ্যের পীড়ন সহ্য করা বরং ভাল। ইহার নাম মিহর-উল-নিসা অর্থাৎ 'রমণী-সূর্য্য' রাখিবেন।"

এমন সময়ে তাঁহাদের উষ্ট্র পান্থশালায় উপস্থিত হইল, সুতরাং তাঁহাদের কথোপকথন এখানেই বন্ধ হইল। বহুকাল পর গীয়াস ও তাঁহার পত্নী সেই পান্থশালায় আবার একটু আরামের মুখ দেখিতে পাইলেন। (ক্রমশঃ)

বৌদ্ধ সাহিত্য।

(জাতকমালা)

গল্পপ্রসঙ্গে উপদেশ দানের প্রথা বহুপ্রাচীন। পুরাণ প্রভৃতি পুরাকালের সাহিত্যে উহার [illegible] প্রমাণ বিদ্যমান। তাহার পর, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত বা বিপর্য্যস্ত হয়, তখনও এই প্রথা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। বরং বৌদ্ধ সাহিত্যে গল্প লেখার রীতি কিছু বেশী মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছিল। "জাতকমালা" নামে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, উহাকে নিরবচ্ছিন্ন গল্প পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই "জাতকমালা" সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষাতেই রচিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ বলেন "দুই সহস্র বর্ষেরও পূর্ব্বে জাতক মালার গল্প সকল বিদ্যমান ছিল।" কথিত আছে;—শ্রাবস্তী নগরীতে অবস্থান কালে ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণকে গল্পচ্ছলে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই "জাতকমালা" নামে আখ্যাত। সংস্কৃত জাতকমালার রচয়িতা শ্রীমান্ আর্য্যশূর খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার ভাষা সরল, বিশুদ্ধ ও ভাবপূর্ণ।*

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায়ই শিক্ষা দানের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে এবং উহার অধ্যয়নে বিলক্ষণ উচ্চ শিক্ষাও হইতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধ নৃপতিদের অধিকারের পর হইতে কখনও কোন সাধারণ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য অধীত বা অনুশীলিত হয় নাই। অধ্যয়ন অধ্যাপন ত দূরের কথা, কিম্বদন্তী এইরূপ;—বৌদ্ধধর্ম্মে অনাস্থা বা বিদ্বেষ বশতঃ ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতি বৌদ্ধ সাহিত্যের উচ্ছেদ সাধনেও কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ঘটনাদৃষ্টে ঐ জনশ্রুতির যাথার্থ্যে অনেকটা বিশ্বাস জন্মে। কারণ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের দুই চারিখানি দার্শনিক গ্রন্থ ব্যতীত অপর যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের বাহিরে নেপাল ও তিব্বতের পুস্তকালয়সমূহে রক্ষিত ছিল, ভারতবর্ষ হইতে একখানিও পাওয়া যায় নাই।

শতবর্ষ [illegible]ধিক হইবে, পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের [illegible] সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত জাতকমালা লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Leiden) ডক্টর কর্ণ (Dr. Hendrik Kern) বিগত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত ও মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে ৩৪টি গল্প আছে।† ঐ সকল গল্প প্রাচীন বৌদ্ধ কবিগণের

---

* 'জাতকমালা' সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,-কৃত, "বুদ্ধদেব" গ্রন্থে দেখুন।

† পালিভাষাবিৎ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ফোজ্‌বোল সাহেব সমগ্র জাতকমালার একটী সংস্করণ বহুদিন হইল প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা রোমান্ অক্ষরে লিখিত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাওয়েল সাহেবের নেতৃত্বাধীনে কয়েকজন জ্ঞানপিপাসু ইংরেজের যত্নে জাতকের ইংরেজী অনুবাদও অনেক দিন হইল আরম্ভ হইয়াছিল। কিছুদিন হইল

অভিনব রচনাভঙ্গীর পরিচায়ক। এই সকল আখ্যায়িকার অনুরূপ গল্প মহাভারত ও কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভট্ট কর্ণ বলেন;—"শতপত্র জাতক" নামক গল্পটির অনুরূপ কোন উপাখ্যান ভারতীয় সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ঐরূপ গল্প মিশর দেশে প্রচলিত আছে।" ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকগণকে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা জনপদে পরিভ্রমণ করিতে হইত। হয়ত, কোন প্রচারক মিশর হইতে ভারতবর্ষে ঐ গল্পটির আমদানি করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে উহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম।*

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে;—কোন সময়ে ভগবান্ বোধিসত্ব ময়ূরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দয়া-গুণে আকৃষ্ট হইয়া ময়ূর-জন্মেও কোন কীট কিংবা পতঙ্গের প্রাণবিনাশ করিতেন না, কেবল বৃক্ষের কোমল পত্র, পুষ্পের মধু ও নানা সুরস ফলদ্বারা প্রাণধারণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। অন্যান্য পক্ষীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান, যথাশক্তি বিপন্নের উদ্ধার এবং অবিনীত পক্ষীদিগকে অসৎপথ হইতে নিবারণ প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল। পক্ষিগণ তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা, পরম বন্ধু, নিপুণ চিকিৎসক এবং সুবিচারক রাজা মনে করিত। এক দিবস তিনি প্রাণিগণের অনুকম্পার নিমিত্ত বনপথে পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, এক সিংহ যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া আছে। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে সিংহ! তোমাকে বড় অসুস্থ দেখিতেছি, কি হইয়াছে? হস্তীর সহিত যুদ্ধ অথবা মৃগের পশ্চাৎ দ্রুত ভ্রমণে কিংবা ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে তোমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, বল। যদি আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা কোনরূপ প্রতিকার সম্ভব হয়, আমি এখনই করিতেছি।"

সিংহ বলিল, "পক্ষিবর! পরিশ্রমে কিংবা ব্যাধের বাণে আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই, একখণ্ড অস্থি গল-দেশে বিদ্ধ হওয়ায় আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। উহা গিলিতে কিংবা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। সুহৃদের সাহায্যের ইহাই প্রকৃত অবসর, অতএব যদি পার তবে শীঘ্র আমায় যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।" তাহার পর, ময়ূর চিকিৎসাবিজ্ঞানে পটুতা-প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ সিংহের মুখে প্রবেশ করিয়া তাহার গলদেশ হইতে কণ্টক উদ্ধার করিল। এই বিপদ হইতে সিংহকে উদ্ধার করিয়া ময়ূর এত আহ্লাদিত হইল যে, সিংহ যন্ত্রণামুক্ত হইয়াও তত আহ্লাদিত হয় নাই। সিংহ ময়ূরকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিল। একদিন ময়ূর তাহার উপযুক্ত আহার না পাইয়া ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইল এবং [illegible] করিতে করিতে অবসন্ন দেহে সিংহের নিকট [illegible] হইল। সিংহ তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিহত একটি হরিণশিশুর মাংস আহার করিতেছিল। সিংহ যদিও ময়ূর কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছিল কিন্তু তখন ঐ যাচক এবং দীনবদন ময়ূরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না, আপন মনে বসিয়া মহাসুখে আহার করিতে লাগিল। শিলাতলে বীজ বপন করিলে কখনও কি উহা অঙ্কুরিত হয়? নির্ব্বাণ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে কদাচ প্রজ্বলিত হয় না, কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার করিয়া কে কবে প্রত্যুপকার পাইয়াছে? ময়ূরের মন তখনও আশাপাশে আবদ্ধ, সে বিবেচনা করিল, নিশ্চয় সিংহ আমাকে চিনিতে পারে নাই; যাহা হউক, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলে অবশ্য আমাকে অভ্যর্থনা করিবে। তাহার পর, সে নিকটে গিয়া আশী-

---

"ইংরেজী" [illegible]ংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম, যে কাও[illegible] সাহেবের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়া শেষ খণ্ড প্রকা[illegible]ছে। প্রথম চারি খণ্ড পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাঃ মঃ সঃ।

* ইংরেজী ভাষায় "ঈশপের গল্প" নামক যে মনোরম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ আছে—যাহা অনুবাদ করিয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় "কথামালা" নামক পুস্তক লিখিয়াছেন—তাহা বৌদ্ধ জাতকমালা হইতে গৃহীত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, প্রথমে জাতকমালা পালি হইতে আরবী ভাষায় এবং আরবী হইতে ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আমাদের এমনই অদ্ভুত জ্ঞানস্পৃহা [illegible]তক-মালার অনুবাদের অনুবাদ, তস্য অনুবাদ লইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতেছি। আর আমাদের ঘরের রত্ন অপরে সংগ্রহ করিতেছে। বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কাহিনীসমূহ জাতকের গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। ইলোরা ও এলিফাণ্টা প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ মন্দিরে যে সকল অবোধ্য চিত্র খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই জাতকমালার গল্পেরই বিবরণ। শ্রীযুক্ত কানিংহাম সাহেব নাকি জাতকের কয়েকটী গল্পের সাহায্যে কয়েকটী খোদিত চিত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ভাঃ মঃ সঃ

র্বচন উচ্চারণ পূর্ব্বক মৃগমাংসের কিয়দংশ প্রার্থনা করিল। তখন ক্রূর সিংহ কুপিত হইয়া গর্ব্ব সহকারে ময়ূরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল, "যে কখন দয়ারূপ দৌর্ব্বল্য অবগত নহে, যন্ত্রণায় ব্যাকুল মৃগশিশুদিগকে অনায়াসে ভক্ষণ করে, তাহার মুখে প্রবেশ করিয়া তুমি যে এখনও বাঁচিয়া আছ, তাহা কি তুমি যথেষ্ট প্রত্যুপকার মনে কর না? আমাকে গ্রাহ্য না করিয়াই আমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছ? একে অনাহারে ক্ষীণদেহ, আবার শীঘ্রই পরলোক দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে নাকি?" তাহার পর, সেই ময়ূর সিংহের নিষ্ঠুর বাক্যে লজ্জিত হইয়া পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক আকাশে উঠিল। তখন বনদেবতা তাহার অপমান সহিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওহে পক্ষিরাজ! তুমি উপকারী হইয়াও শক্তিসত্বে এই দুরাত্মার কৃত অপমান সহ্য করিতেছ কেন? এই কৃতঘ্নের উপেক্ষা করিয়া তোমার কি ফল হইবে? এই সিংহ বলশালী হইলেও তুমি উহার চক্ষে চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দন্তমধ্যস্থিত আমিষ অনায়াসে হরণ করিতে পার, সুতরাং সামর্থ্য সত্বে এই গর্ব্বিতকে ক্ষমা করা আমি সঙ্গত মনে করি না।"

তাহার পর, সেই ময়ূর সিংহ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়া বলিল, "ঐরূপ নিকৃষ্ট উপায়ে খাদ্য সংগ্রহে আমার প্রয়োজন নাই। উহা আমাদের ন্যায় ব্যক্তিদের প্রকৃত পথ নহে। সাধু ব্যক্তিরা দয়াগুণে আকৃষ্ট হইয়াই বিপন্নদিগকে উদ্ধার করেন, কোনরূপ লাভের আশায় করেন না। অতএব উপকৃত ব্যক্তি উপকার স্মরণ করুক বা না করুক, তাহার প্রতি ক্রোধের কোন কারণ দেখি না! উপকৃত ব্যক্তি সময়ে যে অন্যের কৃত উপকারের কথা ভুলিয়া যায়, উহা প্রতারণা মাত্র। অবশ্য যাহারা প্রত্যুপকার পাইবার জন্য উপকার করিয়া থাকে, তাহারা ভবিষ্যতে কখন ঐরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তিদের উপকার করে না। পরোপকার করা যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে ভাবিয়াই উপকার করেন। অতএব উপকৃত ব্যক্তি উপকার বিস্মৃত হইলে তাহাতে তাঁহারা অনুতাপ করেন না। কারণ উপকারী ব্যক্তি ত প্রত্যুপকার গ্রহণেচ্ছু হইয়া ঋণ দান করেন নাই! উপকৃত ব্যক্তি পরে উপকারের কথা স্মরণ না করিলেও উপকারী ব্যক্তি যশ দ্বারা নিশ্চয়ই অলঙ্কৃত হন। অতএব হৃদয়বান্ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি কৃতঘ্নের অপকার করিয়া স্বীয় যশ কলঙ্কিত করিতে পারেন? যে ব্যক্তি পূর্ব্বে সাধু ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াও পরে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা না করে, তাহার প্রতি আর কিছুই বক্তব্য নাই, আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

বনদেবতা ময়ূরের ঐরূপ মনোহর উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধন্যবাদ সহকারে বলিলেন, "আপনি যদিও জটাবল্কল ধারণের পরিশ্রম অঙ্গীকার করেন নাই, তথাপি আপনার ঋষিত্ব সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মুনিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত বেশভূষার অপেক্ষা করে না, যিনি মুনিজনোচিত গুণলাভ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ মুনি।" তাহার পর বনদেবতা ময়ূরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ভক্তগণ বলেন, ভগবান্ বোধিসত্ত্ব পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাণিগণকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।"

এই রূপ সরল উপদেশপূর্ণ অনেকগুলি গল্প জাতকমালায় আছে। ইহার লেখা প্রায়ই গদ্য, মধ্যে মধ্যে পদ্য আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের 'ললিতবিস্তর', 'মহাবস্তু', 'করুণাপুণ্ডরীক', 'সুবর্ণপ্রভা' প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রন্থই গাথা ভাষায় লিখিত, সুতরাং উহাকে সুবিশুদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। আর্য্যশূরের 'জাতকমালা' শান্তিপ্রভের 'বোধিচর্য্যাবতার' অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' প্রভৃতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বিশেষতঃ জাতকমালা ও বুদ্ধচরিত মনোহর কবিত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ইংলণ্ডপ্রত্যাগত বহুভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম, এ, মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতকমালা ও বুদ্ধচরিত অন্যতম সংস্কৃত পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ফ্রেজারগঞ্জ।

আজ কয়েক দিবস হইল আমরা ফ্রেজারগঞ্জ বেড়াইয়া আসিয়াছি। গত বৎসর এই সময়ে খবরের কাগজে ফ্রেজারগঞ্জের বড় নাম বাহির হইয়াছিল। তখনই তথায় যাইতে বড় সাধ হয়, কিন্তু তৎকালে আমরা যাওয়ার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এবার হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যার সময় আমার স্বামী আফিস অঞ্চল হইতে বাড়ী আসিয়াই বলিলেন, "চল, ফ্রেজারগঞ্জে যাবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে ?" তিনি বলিলেন, "কবে কি ? এই মুহূর্ত্তে। রাত্রে ৯টায় জাহাজে উঠিতে হইবে, এখন ৭টা বাজে। সঙ্গে নিরঞ্জন (আমাদের পাচক) যাবে, নতু 'হরিবাসর' করিতে হইবে।" তাড়াতাড়ি আমরা আহারাদি করিয়া আমাদের পুরাতন ভৃত্য এবং পাচককে সঙ্গে করিয়া চলিলাম। কিন্তু নিরঞ্জন বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিতে বড় দেরি করিয়াছিল; আমরা জাহাজ ঘাটে (আরমেনি ঘাটে) পৌঁছিয়া দেখি জাহাজের সিঁড়ি তুলিয়া ফেলিয়াছে এবং জাহাজের নঙ্গর তোলা হইতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া লইল।

কলিকাতা আরমেনি ঘাট হইতে সুন্দরবন দিয়া প্রতিদিন একখানা করিয়া জাহাজ কাছাড় যায়। এই জাহাজ ছয় দিনে বরাবর কাছাড় শিলচর পৌঁছায়। আমরা যে জাহাজে গিয়াছিলাম তাহার নাম ডালা (Dallah)। জাহাজখানি বেশ সুন্দর। আমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, এই লাইনে দুই তিনখানা পুরাতন জাহাজ আছে, তাহা তত সুবিধা জনক নয়। এই লাইনের নূতন কয়েকখানি জাহাজ প্রস্তত হইয়াছে। সেগুলি তেতালা। সাধারণতঃ জাহাজের প্রথম শ্রেণীর কেবিন ও ছেলুনের (Saloon) সম্মুখের ছাদের (quarter deck) একটা অংশে থাকিয়া সারেং অর্থাৎ জাহাজের দেশী কাপ্তান, সুকানী, (অর্থাৎ জাহাজের হাইলের চাকিচালক) এবং আর্‌কাটী (pilot) অর্থাৎ জাহাজের পথপ্রদর্শক এবং এক জন খালাসী জাহাজ চালাইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদেরও অনেক সময় অসুবিধা হয়, কারণ সম্মুখে সাহেব বিবিগণ বসিয়া থাকেন, সময় সময় তাহারা সম্মুখটা দেখিতে পায় না। আর সাহেব বিবি, বিশেষতঃ বিবিগণের বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হয়, যে 'কালা আদমীগণ' তাঁহাদের এত কাছে রহিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি যে নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে সারেং সুকানী প্রভৃতিকে ছাদের উপরে তেতালায় "চিলে কোঠার" ন্যায় ছোট একটী ঘর হইতে জাহাজ চালাইতে হয়, আর জাহাজের সমস্ত ছাদ (quarter deck) প্রথম শ্রেণীর আরোহীগণ ভোগ করিতে পারেন। যাহাহউক "ডালা" জাহাজে এই নূতন বন্দোবস্ত না হইলেও জাহাজ খানা অতি সুন্দর। কেবিনগুলির দুই ধারে দরজা ও জানালা থাকায় খুব হাওয়া খেলে।

কলিকাতা হইতে ফ্রেজারগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া চারি টাকা, যাতায়াত ছয় টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন নাই, তবে দুই টাকা ভাড়া দিলে ক্যান্‌ভাস্ দিয়া ঘেরিয়া একটা কেবিনের মত করিয়া দেয়। আমাদের টিকিট কিনিতে হয় না, আমার স্বামীর প্রথম শ্রেণীর পাস আছে, সস্ত্রীক দুই জন, কি আবশ্যক হইলে ততোধিক চাকর সহ এই কোম্পানীর জাহাজে সর্ব্বত্র বিনা ভাড়ায় বেড়াইতে পারেন।

সেদিন জাহাজে প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রী কেহ ছিল না; তাহাতে আমাদের বড়ই সুবিধা হইল। জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে না ছাড়িয়া অনেক বিলম্বে ছাড়িল। জাহাজ ছাড়িবার পর আমরা একবার ছাদে গেলাম। সে দৃশ্য বড়ই মনোরম, এক পার্শ্বে কলিকাতার গঙ্গার ধারের সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি সুসজ্জিত আলোকমালায় গঙ্গাবক্ষে প্রতিভাসিত, অপর পার্শ্বে হাবড়ার অসংখ্য কারখানা অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত এবং গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য পোত ভাসমান। আর অদূরে, ইডেনোদ্যানের সুশোভিত বৃক্ষরাজি বৈদ্যুতিক আলোকে যেন হাসিতেছে। সহরে গরমে প্রাণ বাহির হইয়া যায়, কিন্তু জাহাজে তৎকালে সুশীতল বায়ুহিল্লোল আরোহীর তপ্ত দেহকে স্নিগ্ধ করিতেছিল।

প্রাতঃকালে ক্রমশঃ বজ্‌বজ্ উলুবেড়ে প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া বেলা নয়টার সময় আমরা হীরক বন্দরে

(Diamond harbour) পৌঁছিলাম। জাহাজ যথাসময়ে ছাড়িলে আমরা রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই এই স্থানে আসিতাম। তথা হইতে প্রায় সোজা দক্ষিণমুখী হুগলীনদী (গঙ্গা) দিয়া আমরা সাগরাভিমুখে চলিলাম। নদী এই স্থানে খুব চওড়া এবং এখান হইতে সমুদ্রের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা আনুমানিক দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া সাগর-দ্বীপের উত্তর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখী চ্যানেল ক্রীক (Channel Creek) নামক নদী দিয়া সুন্দরবন যাইতে হয়; আমরা এই নদী দিয়া চলিলাম। নদী ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া অবশেষে অসংখ্য ছোট ছোট খাড়ি দিয়া দক্ষিণে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। জাহাজের সারেংগণ যে এই রূপ সংখ্যাতীত খাড়ি সকলের মধ্যে ঠিক রাস্তা চিনিয়া চলিতে পারে ইহা তাহাদের খুব বাহাদুরী বলিতে হইবে। স্থানে স্থানে খাড়ি এত অপ্রশস্ত যে দুইখানা জাহাজ পাশাপাশি চলিতে পারে না। ঐরূপ স্থানে যদি হঠাৎ দুই খানা জাহাজ আসিয়া পড়ে তবে বড় বিপদ। এই জন্য দুইখানা জাহাজ যখন দুই দিক হইতে আসে, কে কোন্ দিকে যাবে তাহা পূর্ব্বে সঙ্কেতে জানাইতে হয়। জাহাজে যে "ছিটি" (whistle) দেয়, তাহার একটা নিয়ম আছে। যে জাহাজ ডান্ দিকে যাবে তাহাকে হয়তঃ দুই বার "ছিটি" দিতে হইবে, যে বাঁ দিকে যাবে সে তিনবার "ছিটি" দিবে। এইক্ষণ সুন্দরবন অনেক আবাদ হইয়াছে, কিন্তু এখনও জাহাজের ২৪ ঘণ্টার রাস্তা অরণ্যময়। সুন্দরবনের জঙ্গল সাধারণতঃ পাতলা, বড় গাছ কি প্রবীণ গাছ নাই। প্রায় সমান উচ্চ স্তরে স্তরে সজ্জিত বৃক্ষরাজি ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। বৃক্ষের তলায় স্থানে স্থানে হরিণ সকল বিচরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুন্দরবনের বাঘও দৃষ্টি পথে পতিত হয়। আর বড় বড় কুমীর ত গণনা করাই যায় না। সুন্দরবন সম্বন্ধে যে কথায় বলা হয় "ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর" তাহার এখনও সার্থকতা রহিয়াছে। রাত্রিকালে বড় বৈদ্যুতিক বাতি (Search Light) জ্বালিয়া যখন জাহাজ চলে, তখন ঐ স্থানের বড় বাহার। নাটকাভিনয়ের চিত্রপটে (Scene) পাহাড় পর্ব্বতের দৃশ্যগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর এই সমশ্রেণীর সুশোভন বৃক্ষরাজি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া বড় আকারে ঠিক তদ্রূপ দেখায়।

চ্যানেল ক্রীক নদী দিয়া খানিকটা দূরে গিয়া "দো-আগ্রা" নামক এক সরু খাড়ি ধরিয়া সুন্দরবনে যাইতে হয়। সেই স্থান হইতে চ্যানেল ক্রীক দক্ষিণ মুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিন্তু ফ্রেজারগঞ্জে যাব বলিয়া আমরা "দো-আগ্রা" দিয়া গেলাম না। চ্যানেল ক্রীকে দক্ষিণমুখে চলিয়া গণ্ডমুখী নদী হইয়া ফ্রেজারগঞ্জ পাইলাম। তথায় সমুদ্রের এক কোণ দিয়া খানিকটা যাইতে হয়। আর একটু দূরে গেলেই সমুদ্রের বাতাস পাওয়া যায় এবং সফেণ তরঙ্গরাজি দৃষ্টিগোচর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গুরু গম্ভীর ধ্বনি শোনা যায়। সেই বাতাসের মাধুর্য্য অনুভব না করিয়া থাকিলে শুধু বর্ণনা পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ফ্রেজারগঞ্জ একটি ছোট দ্বীপ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বোধ হয় দুই মাইল কি আড়াই মাইল হইবে; একবারে সমুদ্রের উপর গিয়া পড়িয়াছে। ফ্রেজারগঞ্জের পূর্ব্বনাম নারায়ণতলা ছিল। এই স্থানে গবর্ণমেণ্ট একটা স্বাস্থ্যনিবাস করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের বর্ত্তমান ছোটলাট সাহেবের নামে "ফ্রেজারগঞ্জ" রাখিয়াছেন।

দুই বৎসর হইল এই স্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, প্রথম বৎসর কেবল জঙ্গল আবাদ হইয়াছে। সে বৎসর এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল, তন্মধ্যে ৭০,০০০, টাকা ব্যয় হয়। বর্ত্তমান বৎসরে দুই লাখের উপর ব্যয় হইয়াছে। সুন্দরবনের কমিশনর সণ্ডার সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য হইতেছে। চারি জন বাঙ্গালী তথায় আছেন, এক জন পোষ্টমাষ্টার, এক জন ডাক্তার, এক জন ওভারশিয়ার, আর এক জন কেরাণী। সাহেব মধ্যে মধ্যে কার্য্য দেখিতে যান। মান্দ্রাজ অঞ্চল হইতে "জঙ্গলী কুলী" আমদানি করিয়া আবাদের কার্য্য করা হইতেছে। তাহাদের আহার্য্য চাল, ডাল, আটা, চিনি ইত্যাদি কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া আনিয়া সরকারী গুদামে রাখা হয়, কিন্তু তাহা ভদ্র লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।

প্রথম বৎসর জঙ্গল কাটিয়া খাড়ির পাড় দিয়া একটি বাঁধের ন্যায় উচ্চ শড়ক দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য বোধ হয় জলের গতি রোধ করা এবং লোকযাতায়াতের সুবিধা করা। শড়কটি বড়ই অপ্রশস্ত, দুই জনে একসঙ্গে যাওয়া কঠিন। কুলিদের লাইন কতক প্রস্তুত হইয়াছে, বাকি হইতেছে। অন্যান্য ঘরের জন্য সরঞ্জাম ক্রমাগত কলিকাতা হইতে আনা হইতেছে। ফ্রেজারগঞ্জের জল অবশ্য অত্যন্ত লোনা, ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। লৌহের ট্যাঁকিতে (tank) বৃষ্টির জল ধরিয়া পানীয় ও রান্নার জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর কলদ্বারাও (Condensing engines) জল বিশুদ্ধ করা হয়। বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যে বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে। অবিশ্রান্ত কাজ চলিতেছে। কিলবরণ কোম্পানী আপাততঃ একখানা জাহাজ তথায় নঙ্গর করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন এবং সমস্ত কলকব্জাদি উঠাইয়া নিয়া উহাকে এক ভাসমান বিশ্রামঘরে পরিণত করিয়াছেন। ঐ জাহাজের দোতালাতে বাসোপযোগী ৪টি কেবিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতে টেবিল, চেয়ার, কেম্পখাট, এবং গোসলখানা (bath room) ইত্যাদি আছে,কিন্তু জনপ্রাণী নাই। দোতালার মেজেতেও বিছানা করিয়া শুইতে আরাম বোধ হইবে। ধূ ধূ করিয়া বাতাস বহিতেছে, তাহাতেই প্রাণ স্নিগ্ধ হয়। উপরোক্ত কেরাণী বাবু আমাদের নাম ধামাদি লিখিয়া লইলেন। এই স্থানে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের নামের একটা রেজিষ্টার আছে। বাঙ্গালী বড় কেহ আসেন না, বলিলেন। শীতকালে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁবু ভাড়া পাওয়া যায়। ঐ জাহাজ-বিশ্রামঘরে ভাড়া লাগে কি না বলিতে পারিলাম না। আমাদের লাগে নাই।

আহার্য্য কোন জিনিষই সেখানে পাওয়া যায় না, মাছ পাওয়া যায় না। কে ধরিবে? কুলী যাহারা আছে তাহারা আবাদের কার্য্যে, গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যেই ব্যস্ত, আর তাহারা মাছ ধরিতে জানেও না। আর ত লোক মাত্র ৪ জন বাঙ্গালী বাবু। আর জন প্রাণী নাই।

সমুদ্রের চড়াতে আমি স্বামীসঙ্গে বেড়াইতে লাগিলাম, একাকিনী গেলেও কোন আশঙ্কা নাই। সমুদ্রের উপকূলে ভ্রমণ কেবল কল্পনাতেই করিয়াছিলাম,এবার জীবনে তাহা ভোগ করিয়া কি আনন্দ পাইলাম, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। সমুদ্রের সৈকতভূমি নীল বর্ণ এবং বেশ শক্ত। অসংখ্য লাল রংএর কাঁকড়া যেন প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল কাঁকড়া ধরা যায় না, ধরিতে গেলে অমনি বালির ভিতর গর্ত্তে ঢুকিয়া যায়। আমরা বহুকষ্টে দুই তিনটি ধরিয়াছিলাম। আর নানা রং এবং আকারের ঝিনুক ইত্যাদি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানা স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে "সমুদ্রের ফেণা"ও রহিয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টা ঐ চড়াতে হাঁটিলাম, আমার বোধ হয় ৮ মাইলের কম হইবে না। কিন্তু ঐ বাতাসের এমনই গুণ, যে আমরা একটুকু ও ক্লান্তি অনুভব করিলাম না। আমরা চলিতেছি আর সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, আর যাই যাই করিতে করিতে ঢেউ আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে। ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় হইল; ঐ যে শোভা—যাহা বহু কাল কল্পনার চক্ষুতে অনুভব করিয়াছিলাম,—তাহা আজ দেখিয়া জীবন সার্থক করিলাম। এ দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। লাল থালা একখানা যেন সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল। ঐ সময় পশ্চিমগগণে যে কি অনুপম শোভা হয় তাহা বাস্তবিকই দর্শনীয়। নীচে অনন্ত জলরাশি, উপরে অনন্ত আকাশ; উভয়ে যেন দূরে মিলিয়া গিয়াছে, আর অবিশ্রান্ত গম্ভীর ধ্বনিতে যেন ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ঐ দৃশ্য ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে মন চাহে না।

ফ্রেজারগঞ্জ কলিকাতার অতি নিকটে বলিলেও চলে। স্থানটী দেখিলে সকলেরই প্রাণ নিশ্চয় বিমোহিত হইবে। বেশী ব্যয়ও হয় না, অধিক আয়াসও করিতে হয় না। রবিবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে যে জাহাজ আরমেনি ঘাট হইতে ছাড়ে, তাহা ফ্রেজারগঞ্জ হইয়া যায়। আর যে জাহাজ কলিকাতা ফিরিয়া যায় তাহা প্রত্যহই ফ্রেজারগঞ্জ হইয়া যায়। সঙ্গে খাবার জিনিষ নেওয়া আবশ্যক, নতুবা 'হরিবাসর' অনিবার্য্য। প্রথম শ্রেণীতে যাইতে পারিলে খুবই সুখ, তাহা না হইলেও একদল জুটিয়া গেলে কোন কষ্টই হইবে না। আমরা ভোরে ফ্রেজারগঞ্জ

কুমারী মালবেরী।

হইতে রওয়ানা হইয়া অপরাহ্ণ দুইটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

ফ্রেজারগঞ্জে এখন জঙ্গল নাই, কিন্তু কেরাণী আমাদিগকে বলিলেন, যে মধ্যে মধ্যে বাঘের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে অদূরে জঙ্গলে একটা বাঘ দেখিয়া সণ্ডার সাহেব গুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু গুলি বাঘের গায় লাগে নাই।

শ্রীসুনীলাসুন্দরী চৌধুরী।

কুমারী মালবেরী।

কুমারী মালবেরী ভারত-নারী, কিন্তু স্বদেশ অপেক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকায়ই তিনি এখন অধিক পরিচিত। এই প্রতিভাশালিনী মহিলার জন্মস্থান লাহোর। তাঁহার স্বভাবতঃ কল্পনাপ্রিয় মন অতি শৈশবেই কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিত। বাল্যকালে ক্রীড়াসঙ্গিবিহীনা কুমারী মালবেরী একাকী নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার কোমল বালিকাহৃদয় আপন অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনাবলে এক অপূর্ব্ব মানসরাজ্য সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদা তাহাতেই বাস করিত। ছয় বৎসর বয়সেই তিনি চমৎকার গল্প লিখিতে ও বলিতে শিখিয়াছিলেন।

শৈশবেই প্রকৃতির রম্যকানন কাশ্মীর দেশে ভ্রমণ করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বনে বনে বিচরণ, বন্যশোভা দর্শন ও সম্ভোগে তাঁহার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি শৈশবেই অত্যাশ্চর্য্য পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই মানবদুহিতাকে প্রকৃতি দেবী যেন নির্জ্জনে আপনার বনভবনে পাইয়া মনের সাধে অপূর্ব্ব দেহমনের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন।

কুমারী মালবেরী শৈশবে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সুমধুর কণ্ঠ ও সঙ্গীতানুরাগ দর্শন করিয়া বন্ধুগণ ইঁহাকে ইংলণ্ডে গিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শানুসারে তিনি কয়েকখানি পরিচয়-পত্র লইয়া একাকী ইংলণ্ড গমন করেন এবং তত্রত্য "রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ে" প্রবেশ করেন। দুই বৎসর কাল তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে তিনি "বাগ্মিতা-শিক্ষা বিদ্যালয়েও" পাঠ গ্রহণ করিতেন। কঠোর পরিশ্রম বলে এই দুই বৎসরেই তিনি সুগায়িকা ও সুবক্তা হইয়া উঠেন। তাঁহার আবৃত্তিশক্তিও অতি মনোহর। এই সকল চিত্তরঞ্জিনী শক্তির গুণে ইনি ইংলণ্ডে সর্ব্বত্রই অতি আদরে গৃহীত হইয়া থাকেন।

কুমারী মালবেরী অতি উন্নতচরিত্রা নারী। বিদেশে বাস করিলেও স্বদেশের হিতচিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণে জাগরূক। মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁহার শক্তি নিয়োগ করিবার সুযোগ ঘটিলেই আগ্রহের সহিত তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হন।

ইংলণ্ডের ইষ্টএণ্ড্ প্রদেশের অত্যন্ত রূঢ়প্রকৃতি, অশিক্ষিত মদ্যপায়ী শ্রমজীবিদলের নিকট তিনি প্রায়ই তাঁহার সুললিত কণ্ঠে মদ্যপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এই দুরন্ত প্রকৃতির লোকেরাও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হয়, ইহাদের পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার আকুল নিবেদনে বিগলিত হয়। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে উৎফুল্ল হইয়া কতবার তাহারা কুমারী মালবেরীর নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। যুক্তি পরামর্শ ও উপদেশ ইহাদের নিকট ব্যর্থ হইলেও কোমলপ্রাণা সহৃদয়া নারীর বীণাকণ্ঠের অনুরোধ ইহাদের কঠোর চিত্তকে স্পর্শ করে। ইঁহার বক্তৃতাগুণে কত মদ্যপায়ী মদ্যপান ত্যাগ করিতেছে, কত অশান্তিময় পরিবারে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে, স্বামীসত্বেও বিধবার ন্যায় যে সকল রমণী অতি ক্লেশে দিনযাপন করিতেছিল তাহারা আবার স্বামী ফিরিয়া পাইতেছে। পিতাসত্বেও অনাহারে যে সকল বালকবালিকা মৃত্যুর উদর পরিপুষ্ট করিতে যাইতেছিল, তাহারা আবার পিতৃস্নেহ লাভ করিতেছে, পিতার উপার্জ্জিত অর্থ মদ্যবিক্রেতার কোষবৃদ্ধি না করিয়া আবার সন্তানের অন্নাচ্ছাদনের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। স্বর্গের দেবকন্যার ন্যায় তিনি চারি দিকে সুখ, আনন্দ ও শান্তি বিতরণ করিতেছেন।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে কুমারী মালবেরী অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন। সুসভ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ প্রশংসার সহিত গৃহীত হয়, তাহাতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট

পরিচয় পাওয়া যায়। "ভারতে নূতন চিন্তা," "নূতনও পুরাতন ধর্ম্ম", "ভারতের প্রেমতত্ব", "সুখতত্ব" এবং বিবিধ দার্শনিক বিষয়ে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি আমেরিকায়ও গিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসীগণ অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের দ্বারা সেখানে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সে দেশের লোক তাঁহাকে সম্রাজ্ঞীর ন্যায় সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। আমেরিকায় অনেক মহিলা-সমিতিতে তিনি ভারতবর্ষের নারীগণের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনেক বড় বড় সভায় "জাতীয় অর্থনীতি" প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি যখন আমেরিকা পরিত্যাগ করেন তখন পুষ্পস্তবকে ও বিবিধ উপহারে তাঁহার জাহাজের কুঠরী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কুমারী মানবেরী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী। এদেশে থাকিলে অবশ্যই তাঁহার শক্তিবিকাশের এত সুযোগ ঘটিত না। তাঁহার বিকশিত শক্তি লইয়া তিনি আবার স্বদেশে আসিয়া স্বদেশবাসীগণের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইলে নিশ্চয়ই দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল, আমরা ভাণ্ডারায় আছি। মিঃ রায়ের সহিত আমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। তিনি কখনো অধিক কথা কহিতেন না, আমিও যতদূর সম্ভব দূরে দূরে থাকিতাম। তবে তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে যেন গভীর করুণা অঙ্কিত দেখিতাম। আমি কত বার সহসা দেখিয়াছি, তিনি আসিয়া আমার সেলাইয়ের বাক্স লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন। কখনও বা আমার পরিত্যক্ত পুস্তক লইয়া দেখিতেছেন। কিন্তু আমাকে দেখিয়া এত সম্ভ্রমের সহিত কথা কহিতেন, যে আমার অতিশয় লজ্জা বোধ হইত। আমি যে ঘোরতর লজ্জাহীনা তিনি তাহা জানিয়াছেন, তবু আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, আশ্চর্য্য!

এক দিনের একটি সামান্য ঘটনায় আমার মনের স্রোত অন্য দিকে ফিরিল। সে দিন আমরা সকলে বেড়াইতেছিলাম। যখন ফিরিয়া আসি, আমার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে একটি পিনে সংবদ্ধ একটী ক্ষুদ্র গোলাপ ফুল মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি তুলিবার অগ্রেই তিনি তাহা তুলিয়া বলিলেন, "এটা আর কি করিবেন, ছিঁড়িয়া গিয়াছে।" তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, সেটি তাঁহার কোটের বোতামে রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইলাম। তবে তিনি আমায় ঘৃণা করেন না! তা'হলে আমার ছিন্ন ফুল তিনি কখনই সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেন না। একটি অতি সামান্য ঘটনা, তবু মনে যেন একটি সুখের হিল্লোল বহিয়া গেল। আমি যে ভালবাসি তাহা ত আর আমার নিকট গোপন নাই, অবশ্য তাহা প্রাণের অতি গোপন স্থানেই লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার সেই প্রণয়ের স্রোতে কি অন্য প্রাণকেও টানিতেছে? কে জানে!

এই প্রকারে আমাদের সময় কাটিতে লাগিল, এমন সময় সহসা মিঃ দত্ত ভাণ্ডারা হইতে বদলী হইলেন। প্রথমে আমি মনে করিলাম, ভালই হইল। যেমন মুগ্ধ মন্ত্রাহত পতঙ্গের মত জ্বলন্ত অগ্নিতে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তাহার প্রতিফল ত সারা জীবনই সহিতে হইবে। কেন আর সেই অগ্নির সম্মুখে আপনার নির্লজ্জ প্রাণ লইয়া খেলা করিব। আমি মিঃ রায়ের সম্মুখে কি প্রকার সঙ্কুচিত হইয়া, কি প্রকার আত্মগোপন করিয়া থাকিতাম তাহা বলা দুঃসাধ্য। তিনি যদি মনে করেন আমি আপনাকে বিক্রয় করিবার জন্য সুখের আশায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা হইলে আমার এ লজ্জা আমি কোথায় রাখিব? তাই মিঃ দত্তের ভাণ্ডারা হইতে বদলী হইবার সংবাদে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

আমরা কয়েক দিন জিনিষ পত্র প্যাক্ করিতে, সকলকার নিকট বিদায় লইতে অতিশয় ব্যস্ত রহিলাম।

ক্রমে আমাদের যাত্রার দিন আসিল, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে মিঃ রায় আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের সেই গম্ভীর ভাব, সেই সম্ভ্রমের সহিত কথায় আমি যেন নিজেকে আরও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিলাম।

আমরা ষ্টেশনে আসিলাম, সেই সময় ভাণ্ডারা ছাড়িয়া যাইতে আমার হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। যেন কি প্রকার বিষাদময় শূন্যতা আসিয়া আমার হৃদয়কে ঘিরিয়া ফেলিল। ষ্টেশনে আসিয়াই দেখিলাম, মিঃ রায় সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি আসায় মিঃ দত্তের অনেক কার্য্যের সহায়তা হইল। ট্রেণ ছাড়িবার আর দেরি নাই। তিনি আসিয়া আমার করস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আপাততঃ এইখানেই বিদায়, আবার অবশ্যই দেখা হইবে।" সেই করস্পর্শে আমার হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। অজানিত বিষাদে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

আমরা সিউনিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিতে, জিনিষ পত্র ঠিক করিয়া রাখিতে দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তাহার পর সেখানকার লোকদের সঙ্গে মেলামেশা, যাওয়া আসা আরম্ভ হইল। সেখানে একটি অতি সুন্দর হ্রদের মত পুষ্করিণী ছিল, সে দেশের সাহেব মেমেরা প্রায়ই তাহাতে বোটে করিয়া সন্ধ্যার সময় ভ্রমণে বাহির হইতেন। ইহাতে সকলের বড় আমোদ হইত। আমরাও মাঝে মাঝে সেই আমোদে যোগ দিতাম।

এখানে আসিয়া আমার আবার পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। সহসা জীবনপুষ্প সূর্য্যমুখী ফুলের মত সূর্য্যের কিরণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আবার যেন নিশীথের ঘোর অন্ধকারে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। জীবনের উদ্দেশ্য, গতি সবই যেন আমায় বিদ্রূপ করিতেছে,—কি সাহস, কি দুরাশা! আমি যখন ভাবিতাম, এই ভাবে, এইরূপে কত দিন কাটিবে, তখন আমি কূল কিনারা পাইতাম না। মিসেস্ দত্তের স্নেহ অতুলনীয়, যত্ন অতুলনীয়, কিন্তু আমি কি প্রকারে চিরদিন সেই যত্নের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব? নিজের জীবিকা আমায় উপার্জ্জন করিতেই হইবে। এইরূপ নানা ভাবে আমার হৃদয় আন্দোলিত হইত।

আবার একটি বৎসর কাটিয়া গেল। আমরা শীতকালে ক্যাম্পে বাহির হইলাম। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিলাম। একদিন প্রাতঃকালে একটি গ্রামে আমাদের নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে আমরা উপস্থিত হইলাম। আমি সে দিন অসুস্থ ছিলাম, সেজন্য অপরাহ্ন পর্য্যন্ত একাকী বিশ্রাম করিতেছিলাম। অপরাহ্নে যখন বাহিরে আসিলাম, তখন মিসেস্ দত্ত বা মিঃ দত্ত কাহাকেও দেখিলাম না। চাকরদের জিজ্ঞাসা করায় বলিল, মিসেস্ দত্ত অদূরবর্ত্তী এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা ডাকের চিঠি দিয়া আসিয়াছে। আমি সেই দিকে চলিলাম, দেখিলাম, মিসেস্ দত্ত বসিয়া আছেন, আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম, তবু তিনি ফিরিলেন না, বা কোন প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহার নিকটে গিয়া দেখি, তিনি নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন, চক্ষু মুদ্রিত, তাঁহার হস্তে একখানি খোলা চিঠি, তাঁহার বক্ষের উপর একখানি বিলাতের খাম। আমার অন্তর শুকাইয়া গেল, আমি তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিব ভাবিলাম, হস্তের স্পর্শ কি হিম-শীতল। তাঁহার মুখেরও ভাবান্তর হইয়াছে, আমি সভয়ে চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকিলাম। বেহারা ও আয়া ছুটিয়া আসিল, তাহারা তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তবে কি প্রাণ নাই? ললাটে হাত দিলাম, তাহাও হিমের মত শীতল। আমার তখনকার মনের ভাব বর্ণনা করিবার আমার ক্ষমতা নাই। একজন চাকর ছুটিয়া মিঃ দত্তকে ডাকিতে গেল। আমরা মিসেস্ দত্তের মুখে জল সেচন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই জ্ঞানোদয় হইল না। তারপর আমরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে আনিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মিঃ দত্ত আসিলেন, তাঁহার সেই আকুল, ব্যথিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আসিয়াই মিসেস্ দত্তকে সেই অবস্থায় দেখিয়া গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। তৎপরে তাঁহার যন্ত্রাদি লইয়া বিশেষরূপে তাঁহার হৃদয়ের গতি,

Imp. 3926
dt. 27/8/09
RARE BOOK

নিঃশ্বাস ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া, যন্ত্রাদি দূরে ফেলিয়া দিয়া সেই শয্যাতলে মুখ লুকাইলেন। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না। যে ভয়ে আমার হৃদয় শুষ্ক হইতেছিল, তাহাই ঘটিল। স্নেহময়ী জননীতুল্য মিসেস্ দত্তের আত্মা আর ইহলোকে নাই। আমি কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রাহতের মত বসিয়া রহিলাম। তৎপরে যখন সেই মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল আর সে স্নেহ ইহজন্মে অনুভব করিব না, আর সে মধুর কথা কখনো শুনিব না, আমি এই অকূল সংসারে আবার একাকী, কোথায় যাইব, আমার কি হইবে,—তখন আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি চক্ষের জলে অন্ধ হইলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শোকের প্রথম বেগ উপশমিত হইলে, মিঃ দত্ত সেই পত্র পাঠে জানিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিলাতে সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইয়াছে, জীবন সংশয়। মিসেস্ দত্তের হৃদয় চিরদুর্ব্বল ছিল, সন্তানের বিরহে তিনি বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। সহসা এই সংবাদে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমরা ক্যাম্প হইতে সিউনিতে ফিরিয়া আসিলাম। মিঃ দত্ত ছুটীর দরখাস্ত করিয়া আমায় লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার ছুটীর সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকটেই রহিলাম। ছুটী লইয়া তিনি বিলাত যাইবেন। আমার একান্ত অনুরোধে তিনি আমার জন্য একটি কার্য্য স্থির করিলেন। মিসেস্ চৌধুরী তাঁহাদের পরিচিত বন্ধু, তাঁহার ছোট দুটি কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার আমি গ্রহণ করিলাম।

মিঃ দত্তের ছুটী মঞ্জুর হইল, এবং বিলাত হইতে সংবাদ আসিল, যে তাঁহার পুত্রটি অনেক ভাল আছে, আর বিপদের আশঙ্কা নাই। মিঃ দত্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া শোকে ব্যথিত হৃদয় লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। আমি মিসেস্ চৌধুরীর আশ্রয়ে আসিলাম।

মিসেস্ চৌধুরীরা চৌরঙ্গীতে থাকেন। তাঁহার স্বামী পশ্চিমে ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আছেন। ছোট দুটি কন্যাকে স্কুলে দিবার ইচ্ছা নাই, তদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে তাঁহারা পাহাড়ে যান, সেই জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী রাখিলে ভালই হয়, এজন্য মিঃ দত্তের অনুরোধে আমায় তাহাদের শিক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত করিলেন।

আমার জন্য একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন কন্যা-দিগের পড়িবার গৃহই আমার বসিবার কক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যেদিন বাহিরের কোনও লোক না আসি-তেন, সে দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতেন, অন্য লোক থাকিলে পড়িবার ঘরেই আমার আহার হইত।

আমার জীবনে এই প্রকারে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া লীলা ও শোভার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইয়া, তাহাদের আহারাদি করাইয়া তাহাদের শিক্ষা দিতাম। দ্বিপ্রহরে তাহারা খেলা করিত, আমি তাহাদের বস্ত্রাদির যে স্থান মেরামত ও সেলাই করা আবশ্যক তাহা করিতাম। অপরাহ্নে পুনরায় পাঠাভ্যাস করাইয়া, বৈকালে তাহাদের সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসিতাম। সন্ধ্যায় তাহারা বিশ্রাম করিতে গেলে আমার ছুটী হইত। তখন আমি আপনার জীবনের ঘটনার কথা মনে করিয়া সেই স্মৃতিতে মগ্ন হইতাম। সেই দার্জ্জিলিংএর ঘটনা, মিসেস্ দত্তের সঙ্গে যখন ভাণ্ডারায় ছিলাম সেই সকল ঘটনার কথা মনে পড়িত। ভাণ্ডারায় কিছু দিন কত সুখেই ছিলাম, সেই কথা মনে হইত। আর কি এ জীবনে কখনো দেখা হইবে! কে জানে! আমার অদৃষ্টদোষেই আমার মাতৃস্বরূপিনী মিসেস্ দত্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমায় নিজের কথা এত ভাবিতে হইত না।

মিসেস্ চৌধুরী আমার সহিত কখনও বিশেষভাবে কথা বার্ত্তা কহিতেন না। দু চারিটি আবশ্যকীয় কথা ভিন্ন অন্য কোনও কথার আলোচনা হইত না। মিস্ চৌধুরীরা—মায়া ও সুধা আমার সমবয়সী, তবু তাঁহাদের সহিত আমার কখনও বেশী কথা কহিবার সুযোগ হইত না। আমি ড্রইংরুমে কখনও যাইতাম না, যেদিন কোন বন্ধুবান্ধব না আসিতেন, মিসেস্ চৌধুরী আমায় গান গাহিবার জন্য ডাকিতেন। তবে প্রত্যহ সন্ধ্যার

সময় মিসেস্ চৌধুরীর ড্রইংরুম লোকে পূর্ণ থাকিত, হাস্য কোলাহলে, পিয়ানোর শব্দে, গৃহ উচ্ছ্বসিত হইত।

এই প্রকারে অত লোকের মধ্যে থাকিয়াও আমাকে তাঁহাদের নিকট হইতে বহুদূরে থাকিতে হইত। যখনি অবসর পাইতাম, আপনার জীবনের কথা ভাবিতাম, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই শূন্য মনে হইত। সেই কত আশায়, কত আগ্রহে সিলন হইতে আসিতেছিলাম, মিসেস্ দত্তের অতুলনীয় স্নেহ, আর সেই ছবির কথা; সুরেশের ব্যবহার যখন মনে হইত তখন আমার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিত। তিনি যদি সেই ছবি না পাঠাইতেন, তাহা হইলে ত আর আমায় এত যন্ত্রণা সহিতে হইত না। তার পর মিসেস্ বসুর সেই কথা,—তিনি কি করিয়া মিঃ রায়কে বলিলেন, "তোমার ছবি"—লজ্জায় অপমানে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত! আমি কতবার মনে করিতাম যে সে কথা, সে ছবির কথা আর মনে করিব না, কিন্তু যে পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা শুকাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আর কুঁড়ি বা অস্ফুটন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আমার স্মৃতি কিরূপে লোপ পাইবে?

গ্রীষ্ম কাল আসিবার পূর্ব্বেই মিসেস্ চৌধুরীদের বাটীতে দার্জ্জিলিংএ যাইবার সংবাদ প্রচার হইল। আমার সেখানে আদৌ যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কি হয়? আমি নীরবে তাঁহাদের হুকুমের অপেক্ষায় ও কার্য্যে সমস্ত দিবস ব্যস্ত থাকিতাম। কয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিক হইয়া গেল। আমরা দার্জ্জিলিংএ যাইবার জন্য বাহির হইলাম।

আবার সেই দার্জ্জিলিং! মনের মধ্যে যে কি ভীষণ আন্দোলন হইতে লাগিল, তাহা ভাষায় কি প্রকারে প্রকাশ করিব। সেই যে প্রথমে মিসেস্ দত্তের নিকট বিদায় লইয়া কত আশায় ও আগ্রহে যাইতেছিলাম, আর আজ কি বোঝা লইয়া চলিতেছি। আমার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। আমি এখন স্বাধীন নহি, মনের ভাব গোপন রাখিয়া অন্যের সেবা করিতে হইবে। মিসেস্ চৌধুরীর মেয়ে দুটি বড়ই চঞ্চল, কখনো বা তাহারা ট্রেণের বাতায়নের নিকট ঝুঁকিয়া পড়ে, কখনো বা দুই বোনে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ছুটাছুটি করিতে যায়। আমায় অতি সাবধানে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। সারা পথ কোনরূপে কাটাইয়া, আমরা দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিলাম। মিসেস্ চৌধুরীর পরিচিত বন্ধুবর্গ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, রিক্স ও ড্যাণ্ডি ছিল। আমরা তাহাতে করিয়া জলা পাহাড়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাটীতে চলিলাম। দার্জ্জিলিংএ গিয়া, প্যাকিং খুলিতে ও সকলের দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া রাখিতে কয়েকদিন খুব ব্যস্ত রহিলাম। যখন সব ঠিক হইয়া গেল, আমি অবসর পাইলাম, তখন প্রত্যহ যে কোন সময়ে হোক আমি শোভা ও লীলাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতাম। সঙ্গে একজন বেহারা বা আয়া যাইত। আমার এই প্রকার মুক্ত পথে বেড়াইয়া আনন্দ এই প্রথম হইল। সেবার আসিয়া দার্জ্জিলিংএর কোনও শোভা বা সৌন্দর্য্য দেখি নাই। এইবার আসিয়া সেই অতুল শোভা দেখিলাম, সে শোভা, সে চিত্র ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেই সুন্দর সুপরিষ্কৃত পথ, পথের দুই পার্শ্বে রেলিং, মাঝে মাঝে সুন্দর ঝাউশ্রেণী, সেই সুন্দর সুসজ্জিত পার্ক, প্রভাত-কমলের মত সুন্দর শিশুর দল। সেই নত উইলোর শাখা। প্রতি গৃহের সম্মুখে সামান্য ভূমিখণ্ডে ডালিয়া ও গোলাপ হাসিয়া পথ আলো করিয়া ফুটিয়া আছে। সেখানে সুনিপুণ মালি সর্ব্বদা জল সেচনও করিতেছে না, ফুলের স্বভাবে যেন আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে ফার্ণের গাছ, কত বৃহৎ বৃক্ষের শাখা জড়াইয়া অর্কিডের গাছ উঠিয়াছে, আর ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া আছে। এক এক স্থানে প্যান্‌সি ফুল প্রজাপতির গুচ্ছের মত ফুটিয়া আছে। সে ফুলের সৌন্দর্য্য ভাষায় বর্ণনা হয় না। আমরা আসিবার কয়েক দিন পরে সেখানে পুষ্পপ্রদর্শনী হইল। মিসেস্ চৌধুরীরা সকলেই গিয়াছিলেন, আমাকেও সঙ্গে লইলেন। সে দৃশ্য অতি সুন্দর, মনে হইল, বুঝি জগতের যত সুন্দর পুষ্প একত্রিত হইয়াছে। কোন কোন ফুল ঠিক মোমের মত। নানা বর্ণে সে প্রদর্শনী যেন উজ্জ্বল হইয়াছিল, সে ফুলের রূপসুধা শুধু হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।

আমি কোন কোন দিন অতি প্রত্যূষে 'কাঞ্চনজঙ্ঘার'

সেই তুষারশৃঙ্গ দেখিতে পাইতাম। প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি তাহার উপরে পড়িয়া কি উজ্জ্বল আলো দেখাইত। সে দিকে চাহিয়া থাকিলেই যেন মনের ভিতর কি এক প্রকার গম্ভীর মহান্ ভাব জাগিয়া উঠিত। দেখিতে দেখিতে কেমন মেঘ আসিয়া সেই তুষারশৃঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিত। সে দৃশ্য আর দেখা যাইত না, মনে যেন সহসা ব্যথা লাগিত।

মিসেস্ চৌধুরীর বাটীতে প্রায় সর্ব্বদাই লোক জন আসিতেন। আমাকে দৈবাৎ কখনো ড্রইংরুমে ডাকিতেন, নতুবা আমি সর্ব্বদাই একাকী আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে থাকিতাম। এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

জুন মাস শেষ হইয়া গেল। অনেক লোক দার্জ্জিলিং হইতে চলিয়া গেলেন, মিসেস্ চৌধুরীরা সমস্ত বর্ষা দার্জ্জিলিংএ কাটাইবেন, স্থির হইয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে আমরা সকলেই ড্রইং রুমে বসিয়াছিলাম। এমন সময় মিসেস্ চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র চারু সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, ও আপনার মায়ের নিকট গিয়া বলিল, "মা, আজ ট্রেনে কে এসেছেন জান?" মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন "কে?" চারু বলিল, "মিঃ রায় এসেছেন, তাঁর খুব অসুখ, তাঁকে অতি কষ্টে শোয়াইয়া রকৃভিল হোটেলে লইয়া গেল।"

মিসেস্ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মিঃ রায়?" চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, "সুধীর রায়, আবার কোন মিঃ রায় হবে।" কোন্ মিঃ রায় তাহা জানি না, কিন্তু সুধীর নাম শুনিয়াই আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

মিস্ চৌধুরী বলিলেন, "কি হয়েছে তাঁর?" চারু বলিল, "ঘোড়া থেকে প'ড়ে পায়ে খুব লেগেছে। বোধ হয় ফ্র্যাকচার্ হয়েছে। জ্বর ও হয় শুনিলাম।"

মিস্ চৌধুরী বলিলেন, "মা, তাঁকে এখানে আনিলে হয় না?" মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন "তা এখন কি করে হবে? দেখি, আগে খবর নিতে হবে।"

আমি সে গৃহ হইতে উঠিয়া আসিলাম। কোন্ সুধীর রায় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস নাই। সন্ধ্যার পর সুধা সেই গৃহে আসিলেন, নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে আজ ডাক্তার বাবুর দেখা হ'ল, তিনি বলিলেন সুধীর রায়ের অবস্থা বড় সাংঘাতিক।" আমি সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কোন্ সুধীর রায়?" সুধা বলিলেন, "সুধীর রায় সিভিলিয়ান, আমাদের সঙ্গে খুব জানা শোনা আছে। মায়ের ইচ্ছা দিদির সঙ্গে বিয়ে হয়।" আমি আর সে কথার উত্তর দিলাম না। দু একটা কথা কহিয়া সুধা চলিয়া গেলেন।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সুধীর রায় আমার কে? কিন্তু তাঁর সাংঘাতিক অসুখ শুনিয়া কেন আমার হৃদয় এমন কাতর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল? কেন তাঁর নাম, তাঁর কথা মনে করিতে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছে? তিনি আমার কে, আমি কি একথা বলিতে পারি? আমি তাঁহার কেহ নহি, কিন্তু তিনি যে আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা তাহা কি আমি নিজের নিকট লুকাইতে পারি? তাঁর অসুখ, তিনি কেমন আছেন, একথা জিজ্ঞাসা করিবার পর্য্যন্ত আমার অধিকার নাই?

তাহার পর দিবস আমাকে কেহই তাঁহার অসুখের বিষয় কিছু বলিলেন না। আমি সারা দিন নীরবে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় সুধাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ মিঃ রায় কেমন আছেন?" সুধা বলিলেন, "সেই রকমই আছেন।"

সেই সময় মিস্ চৌধুরী সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন ও আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "কেন, মিঃ রায় কি আপনার পরিচিত?"

আমি কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, "অসুখের কথা কাল শুনিয়াছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

মিস্ চৌধুরী সুধাকে ডাকিয়া লইয়া গৃহের বাহিরে গেলেন, যাইবার সময় সুধাকে বলিলেন, "সব কথায় ওর দরকার কি?"

সত্যই ত আমার দরকার কি! যে কথায় আমার অধিকার নাই তাহাতে আমার দরকার নাই, সে কথা

জিজ্ঞাসা করিবার আমি কে? কিন্তু আমার প্রাণ যে মানিতেছে না!

তিন দিন আমি আর কোনও প্রশ্ন করি নাই, বা কোনরূপ সংবাদ পাই নাই। তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার সময় ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মিসেস্ চৌধুরীদের বাটীতে কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ড্রইং রুম পূর্ণ। গীত, বাদ্য, হাস্য কলরব শ্রুত হইতেছে। আমি শোভা ও লীলার নিকট আয়াকে বসাইয়া একবার বাহিরে আসিলাম। বৃষ্টি তখন একটু কমিয়াছে, আকাশ অন্ধকার, আমাদের বাটী হইতে রক্‌ভিল হোটেল খুব নিকটে; আমি ভাবিলাম, একবার গিয়া হোটেলের ল্যাণ্ড-লেডিকে জিজ্ঞাসা করিব কেমন আছেন। যদি মিসেস্ চৌধুরী জানিতে পারেন তাহা হইলে কি ভাবিবেন? আমি নাম বলিব না স্থির করিয়া, মাথায় শাল জড়াইয়া ম্যাকিণ্টসে আচ্ছাদিত হইয়া দ্রুতপদে রক্‌ভিল হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলের বেহারা আসিল, তাহাকে বলিলাম, একবার ল্যাণ্ডলেডিকে দেখিতে চাই। ল্যাণ্ড-লেডি আসিয়া আমি কি চাহি ও আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি মিঃ রায় কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলাম। ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "এখনও অবস্থা আশাপ্রদ নহে, খুব জ্বর, তবে বিশেষ ভয়ের কারণ উত্তীর্ণ হইয়াছে বোধ হয়। কাল সকালেই বুঝিতে পারা যাইবে।" তাহার পর আমায় জিজ্ঞাসা করিল, মিঃ রায় আমার কেহ হন কিনা। আমি বলিলাম, পরিচিত বন্ধু হন। তাহার পর আমার ইচ্ছা হইল একবার গিয়া দেখিয়া আসি, কিন্তু তাহা কোনমতে পারিলাম না। গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর দিন শুনিলাম, মিসেস্ চৌধুরীরা বলিতে-ছেন, মিঃ রায় অনেক ভাল আছেন, তবে এখনো আশঙ্কা যায় নাই। একটু ভাল আছেন শুনিলে কত আশা হয়। সে কয়দিন কি ভয়ানক মেঘ ও বৃষ্টি, চারিদিকে যেন জমাট অন্ধকার ঘিরিয়া আসিতেছে। মুহুর্মুহু বজ্রের শব্দে গৃহদ্বার যেন কাঁপিয়া উঠিত, বিদ্যুতের প্রভায় কাচের দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে আলোক ঝলসিত হইত। চারিদিকে ঝরণা হইতে জল পড়িত, সে শব্দ যেন সেই নিস্তব্ধ প্রদেশকে জাগরিত করিয়া রাখিত। সেই প্রকৃতির সহিত যেন আমার দুরন্ত হৃদয়ের সকল কথা, সকল ভাব মিলিয়া গেল। তিনি আমার কেহ নন, কিন্তু আমার হৃদয় ত একথা মানে না। তিনি বাঁচিয়া থাকুন, সুখী হউন, আমি এই চাই। আমার সুখ দুঃখ আর কিছু নাই। আমার জীবন-কাব্য শেষ হইয়া গেছে।

কয়েক দিন পরে প্রভাত কালে আকাশ মেঘমুক্ত হইল। সূর্য্যের কিরণ সিক্ত বৃক্ষপত্রে, পুষ্পদলে ছড়াইয়া পড়িল। যেন তাহা ধরিত্রীর জীবন স্বরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মেঘমুক্ত আকাশ দেখিয়া দার্জ্জিলিংবাসীরা দলে দলে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইলেন। অদূরে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলি রৌদ্রকিরণে জ্বলিতে লাগিল। মিসেস্ চৌধুরীরা সকলে একত্রে বাহির হইয়া গেলেন। আমিও শোভা এবং লীলাকে লইয়া পার্কে বেড়াইতে বাহির হইলাম। সেদিন তাহারা পার্কে কয়েকটি সমবয়সী বন্ধু পাইয়া খুব খেলায় মন দিল। আমি এক পাশে একটি বেঞ্চে বসিয়া রহিলাম, দুই ঘণ্টা পরে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম একখানি রিক্‌স ও কয়েকটি লোক রহিয়াছে। ভাবিলাম, কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

আমি শোভা ও লীলাকে লইয়া পড়িবার ঘরে, পিয়ানো শিখাইবার জন্য বসিলাম। তাহারা দুই জনেই বাজাইতে বসিয়া গেল। এমন সময় দ্রুতপদে মিস্ চৌধুরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মিস্ বসু, আজ আর শোভা লীলাকে বাজনা শিখাইতে হইবে না। মিঃ রায়কে আজ আমরা এখানে আনিয়াছি, তাঁর শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, শোভাদের আজ একটু দেখিবেন, যেন বেশী গোল না করে।"

আমার হৃদয়ের রক্তস্রোত যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, "আমি সাধ্যমত দেখিব।"

মিস্ চৌধুরী চলিয়া গেলেন। একি অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস। আমি নদীবক্ষে ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় না চলিয়াছি, ডুবিতেছিও না কূলও পাইতেছি না। শুধু আকুলতায় আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। যাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া-

ছিলাম, কে জানিত তাঁহার সঙ্গে আবার দেখা হইবে, আবার একই গৃহের তলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে!

আমি এখন কি করিয়া বলিব, যে আমি অপরিচিত। আমি সাধ্যমত আপনাকে সাবধানে রাখিতাম, যে কক্ষে তিনি ছিলেন সেদিকেও যাইতাম না।

শোভা একটু বড় হইয়াছিল, সে মাঝে মাঝে আসিয়া দু একটা কথা বলিত, তাহাতে জানিয়াছিলাম, মিঃ রায় অনেক সুস্থ হইয়াছেন, ড্রইং রুমে মাঝে মাঝে আসেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি বসিয়া আছি, এমন সময় বেহারা আসিয়া বলিল, "মেম সাহেব সেলাম দিয়া।" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সকলেই ড্রইং রুমে আছেন। আমি কি যাইব না বলিব? আমি বেতনভোগী দাসী। কিন্তু এখনি দেখা হইবে, তা'হলে কি হইবে? আমি কম্পিতহৃদয়ে ধীরে ধীরে সেখানে উপস্থিত হইলাম।

গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে, চারিদিকে সকলে বসিয়া আছেন, আমি সঙ্কুচিত হইয়া দেখিলাম, (দেখিবারও সাহস নাই) মিসেস্ চৌধুরী সম্মুখে বসিয়া আছেন, মিঃ রায় একটি কোচে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। মিসেস্ চৌধুরী আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"আসুন মিস্ বসু, মিঃ রায়ের সহিত আলাপ করাইয়া দি। শোভা ও লীলা আপনার গানের প্রশংসা করায় মিঃ রায় আপনার গান শুনিতে উৎসুক হইয়াছেন।" আমি অগ্রসর হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য চাহিলাম। তিনি হাসিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মিস্ বসু কি ইহারি মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছেন?"

আমার হস্ত কম্পিত হইল, আমি কিছুই বলিলাম না। বলিবার কথা পাইলাম না। মিস্ চৌধুরী ও মিসেস্ চৌধুরী উভয়ে বলিলেন, "সত্য নাকি, মিস্ বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে, কোথায় কবে দেখিয়াছিলেন? মিস্ বসু ত এতদিন আপনার কথা শুনিয়াছেন, কই কিছুত বলেন নাই।"

তিনি বোধ হয় আমার হৃদয়ের ভাব একটু বুঝিলেন; বলিলেন, "মিস্ বসু যখন ভাণ্ডারায় মিসেস্ দত্তের নিকট ছিলেন, তখন হইতেই আমি মিস্ বসুর নিকট পরিচিত হইয়াছি। শোভা লীলা ত মিস্ বসুর গানের খুব প্রশংসা করিল, ভালই হইল, একটি গান শুনি।"

মিস্ চৌধুরী বলিলেন, "কেন এত দিন কি গান শোনেন নাই?"

মিঃ রায় বলিলেন, "কই মিস্ বসু ত কখন গাহেন না।"

মিসেস্ চৌধুরী পুনরায় আজ্ঞা করায় আমি পিয়ানোতে হাত দিলাম, কি গাহিব? সেই প্রণয়ের মৃত্যুসঙ্গীত বাজাইয়াছিলাম, তাহার পর আর ত কখনো বাজাই নাই। আমি ধীরে ধীরে বাজাইলাম।

"আমি সংসারে মন দিয়েছিনু,
(তুমি) আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু,
(তুমি) দুঃখ বলে সুখ দিয়েছ।"

তাহার পর আরও দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া উঠিলাম। মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন, "শোভা ও লীলার খাবার সময় হ'ল।" আমি ধীরে ধীরে তাহাদের লইয়া বাহিরে আসিতে উদ্যত হইলাম। মিঃ রায় বলিলেন, "মিস্ বসু, এখানে যে কয়দিন আছি মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া এই রুগ্ন ব্যক্তিকে দু একটি গান শোনাইতে ভুলিবেন না।" আমি দেখিলাম মিসেস্ চৌধুরীর মুখ বড় অপ্রসন্ন, বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া আসিলাম।

শোভা বলিল, "মিস্ বসু, কাল হইতে আমাকে মিঃ রায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি তাঁকে অনেক দিন থেকে জান?"

আমি বলিলাম, "তিনি কি করিয়া জানিলেন, আমি এখানে আছি?" শোভা বলিল, "আমি যে কাল বলেছিলাম তুমি খুব ভাল গাহিতে পার। আর বলিলাম যে তুমিই আমাদের গান বাজনা শেখাও। মিঃ রায় বলিলেন, তোমাদের মিস্ বসুর নাম কি; আমি বলিলাম মণিকা। তিনি হাসিলেন। মা কিন্তু আমার উপর রাগ কচ্ছেন। কেন মিস্ বসু, তুমি মিঃ রায়ের সম্মুখে গেলে ওঁরা রাগ করেন?"

আমি কি বলিব। তাহাকে অন্য কথায় ভুলাইয়া দিলাম। আমি তাহার পর আর ড্রইংরুমে যাই নাই, বা মিসেস্ চৌধুরী ডাকিয়া পাঠান নাই। সর্ব্বদাই আমি সশঙ্কিত হইয়া থাকিতাম। একদিন শুনিলাম মিসেস্

28(A)

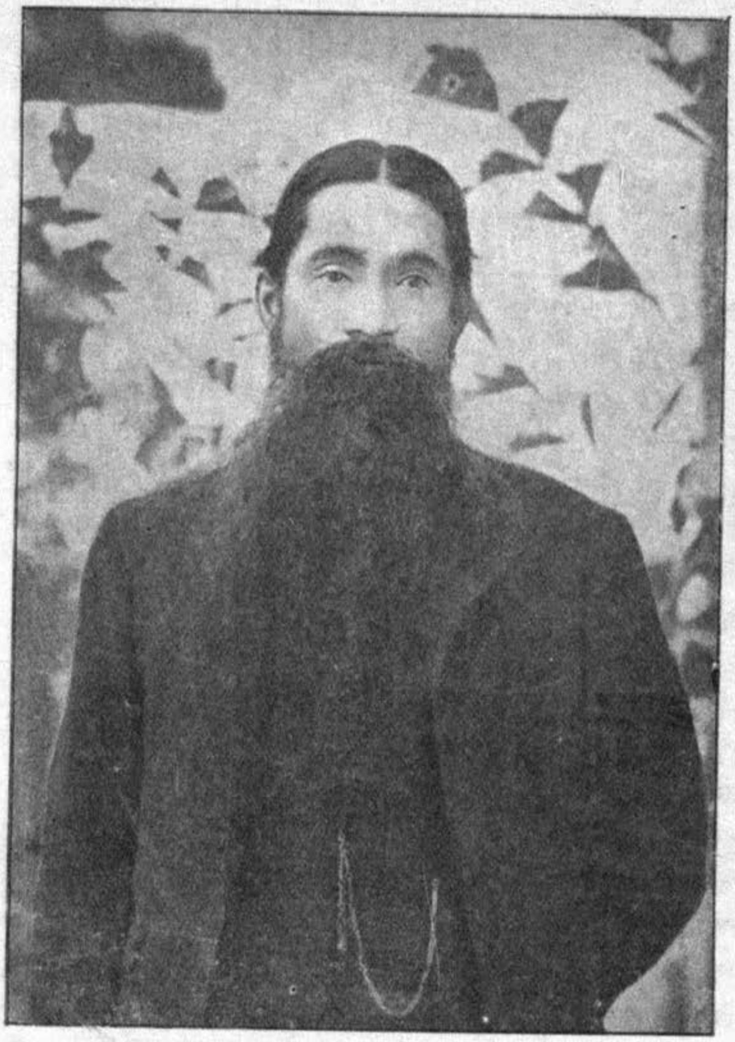

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

28(A)

চৌধুরী ও মিস্ চৌধুরীরা দোকানে যাইতেছেন, আমাকে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "শোভা লীলাকে যেন এখনি পড়ান হয়।" আমি তাঁহাদের আজ্ঞামত শোভা ও লীলাকে লইয়া তাহাদের পড়িবার ঘরে গিয়া পড়াইতে ব্যস্ত রহিলাম। এমন সময় ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত হইল। লীলা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল,' দেখিলাম মিঃ রায়! আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। তিনি গৃহে আসিয়াই শোভা লীলাকে বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্য কেমন সুন্দর চকোলেটের বাক্স এনেছি, ড্রইংরুমে আছে, নিয়ে এস।" তারা ছুটিয়া গেল। তিনি আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইলেন, গম্ভীরভাবে আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেনঃ—

"দুটী কথা আমায় বলিতেই হইবে। আমার সহিত কেন দেখা করেন না? স্ব-ইচ্ছায়?"

আমার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল, আমি নতমুখে বলিলাম, "আমি স্বাধীনভাবে মিশিবার উপযুক্ত নই, আমার সে ক্ষমতা আর নাই।"

তিনি বলিলেন, "সেই যে ভাণ্ডারা হইতে আপনারা চলিয়া গেলেন, তাহার পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আপনি আর অপরিচিতের মত ব্যবহার করিবেন না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এবার দেখা হইবার পর একটিও কথা কহিলেন না, আমি এ জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছি।"

আমি যে কি বলিব, জানি না; জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন বেশ ভাল আছেন ত?"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এটুকু জিজ্ঞাসা করিবার বুঝি এতদিন অবসর হয় নাই?"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "ক্ষমা করুন, সেটুকু স্বাধীনতা আমার এখন আর নাই, জানিবেন।"

তিনি বলিলেন, "তা বেশ বুঝিতেছি"—এমন সময় শোভা লীলা ফিরিয়া আসিল। তিনি দু একটি অন্য কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার চক্ষে যেন নূতন আলোক জ্বলিয়া উঠিল, আমি যেন তাঁহার হৃদয়ের ভাষা বুঝিলাম; বুঝিলাম, যে সে হৃদয় আমার আর অপরিচিত নহে। কি যেন সুখের আভাসে আমার জীবন পুনরায় আশাদীপ্ত হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিগত ২১এ জুলাই ভারতের স্বনামধন্য সুসন্তান মহাত্মা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্তের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। পারসী বণিক জিজিভয়ের বৃত্তি লইয়া তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পিতা একজন এটর্ণি ছিলেন। উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টারী কার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি মাসে তিনি বহু সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন।

উমেশচন্দ্র বড় সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সকলই সাহেবীধরণের ছিল। ইংলণ্ডে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ইংরেজপরিবারে তিনি পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তিনি সেখানেই বসবাস করিতেছিলেন। হয়ত কালে তাঁহার ভবিষ্যৎবংশের সহিত এদেশের আর কোন সম্বন্ধই থাকিবে না, কিন্তু উমেশচন্দ্রের মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ অটুট ছিল। বিলাতে থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা এদেশের হিতচিন্তা করিতেন ও এদেশের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেন।

উমেশচন্দ্রের স্বদেশানুরাগে প্রীত হইয়া ভারতবাসীগণ তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তিনিই সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনেও এলাহাবাদে তিনি সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। দেশের সেবায় তিনি সর্ব্বদাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

গবর্ণমেণ্টের নিকটও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি কিছুকালের জন্য ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম সভ্যরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান জাতীয় মহা আন্দোলনের দিনে উমেশচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী স্বদেশভক্ত সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয় বিপদরূপে গৃহীত হইতেছে।

পুনর্ম্মিলন।

জননীর দ্বারে আজি
মিলেছি সবাই,
এক সাথে ছোট বড়
শত শত ভাই।
কেবা ধনী মানী, কেবা দুখী দীন,
কেবা গুণী জ্ঞানী, কেবা জ্ঞানহীন,
কোন ভেদ নাই,
মোরা সবে ভাই।

গোধূলির ক্ষণে, ফিরে
লয়ে ধেনুপাল,
গোঠ হ'তে গান গেয়ে
আয়রে রাখাল;
মাঠ হ'তে লয়ে আঁটি আঁটি ধান
ত্বরা করে আয় শ্রান্ত কৃষাণ
মার কাছে যাই।
—আয় আয় ভাই।

হীন দ্বেষ, অভিমান,
চির তরে ভুলি',
ভাই ভাই সবে আজি
করি কোলাকুলি।
এক ডোরে বাঁধা আমরা সকলে,
এক স্নেহময়ী জননীর কোলে
সবাকার ঠাঁই—
মোরা সবে ভাই।

শ্রীমন্মনীমোহন ঘোষ।

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত।

মহাত্মা বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ সাহিত্য ভারতের অমূল্য সম্পত্তি। প্রবল শক্তিশালী হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য এদেশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সত্যের বিনাশ নাই, তাই যুগ যুগান্তর পরে এখন সুদূর চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা এবং সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে বুদ্ধদেবের প্রচারিত স্বর্গীয় উদার উপদেশগুলি ও পালি বৌদ্ধ সাহিত্য আবার আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে ফিরিয়া আসিতেছে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের যত্নে পালি ভাষার উপযুক্ত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাস ও ভাষা-বিজ্ঞানের অতি মূল্যবান তত্ত্ব সকল পালি সাহিত্যের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এখন আশা করা যায়, পালিভাষার অনুশীলন দ্বারা ভারতেতিহাসের এই সকল মূল্যবান উপকরণ অচিরে সংগৃহীত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ পালিভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রিস্ ডেভিড্স্ (Rhys Davids) বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র পালি ত্রিপিটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"ভারতীয় সাহিত্যে বেদ ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থই ত্রিপিটক অপেক্ষা প্রাচীন নহে। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য বৌদ্ধসাহিত্য দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, সুতরাং ইহা বলা কিছু মাত্র অত্যুক্তি নয় যে, কি মানব জাতির প্রাচীন তত্ত্ব, কি ভাষাবিজ্ঞান, কি সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিজ্ঞান—এ সকলের তথ্যাবিষ্কারে বেদের প্রচার অপেক্ষা ত্রিপিটকের প্রচার কিছুতেই অল্প প্রয়োজনীয় নহে।"*

---

* "In the history of Indian literature there is nothing older than these works, ex—cepting only the Vedic writings; and all the later classical Sanskrit literature has been profoundly influenced by the intellectual struggle of which they afford the only direct evidence. It is not, therefore, too much to say, that the publication of this unique literature will be no less important for study of history—whether anthropological, philological, literary or religious than the publication of the Vedas has already been. (Rhys Davids in the "Journal of the Pali Text Society.")

ইউরোপে বেদের প্রচার হওয়াতে এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রতি পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; তাহাতে এদেশবাসীরাও এখন বেদাদি শাস্ত্রালোচনায় মনোযোগী হইয়াছেন; ইউরোপে এখন পালির চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং এদেশেও পুনরায় পালির সম্মান হইবে।

সামান্য সংস্কৃতজ্ঞান থাকিলে সহজেই পালি ভাষা শিক্ষা করা যায়। ভারত-মহিলার পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত জানেন। তাঁহারা যদি পালিভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হন তবে বিবিধ পালিগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তাঁহারা বঙ্গভাষার প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন।

সম্প্রতি অমূল্য পালিগ্রন্থ "মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত" বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই পুস্তকের ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে পালি ভাষার কিছুই জ্ঞান জন্মে না, এজন্য পালি ও তৎ-সঙ্গে তাহার সংস্কৃতানুবাদও দিতেছি। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইবে না বলিয়া ভারত-মহিলায় ইহার কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইল।

"মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত" ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহা এক খানি প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ তিন মাসের ঘটনাবলী ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। জাতীয় একতাবন্ধন, নারীজাতির প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধদেবের উদার উপদেশ ও বিবিধ মূল্যবান ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভ।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।

নমস্তস্মৈ ভগবতেঽর্হতে সম্যক্ সম্বুদ্ধায়॥

পালি—এবম্মে সুতম্।

সংস্কৃত—এবং ময়া শ্রুতম্।

পা—একং সময়ং ভগবা রাজগৃহে বিহরতি গিজ্ঝকুটে পব্বতে।

সং—একস্মিন্ সময়ে ভগবান্ (বুদ্ধদেবঃ) রাজগৃহে গৃধ্রকূটে পর্ব্বতে বিহরতিস্ম।

পা—তেন খো পন সময়েন রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জি অভিযাতুকামো হোতি।

সং—তেন খলু পুনঃ সময়েন রাজা মাগধো (মগধস্য-ইত্যর্থঃ) অজাতশত্রুঃ বৈদেহীপুত্রঃ বৃজিনঃ অভিযাতুকামঃ (আক্রমণেচ্ছুঃ) অভূৎ।

পা—সো এবমাহ অহং ইমে বজ্জি এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে উচ্ছেজ্জামি বজ্জি বিনাসেস্সামি বজ্জি অনয়ব্যসনম্ আপাদেস্সামীতি।

সং—সঃএবমাহ অহং এবং মহর্দ্ধিকান্ (মহতী ঋদ্ধিঃ যেষাং তান্, মহাসমৃদ্ধিশালিনঃ) মহানুভাবান্ (মহা পরাক্রমশালিনঃ) ইমান্ বৃজিনঃ উচ্ছেৎস্যামি (নাশয়িষ্যামি) বিনাশয়িষ্যামি অনয়ব্যসনং (বিপজ্জনিতং দুঃখং) আপাদয়িষ্যামি (প্রাপয়িষ্যামি) চ।

পা—অথ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহি-পুত্তো বস্সকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামত্তং আমন্তেসি।

সং—অথ খলু রাজা মাগধো অজাতশত্রুর্বৈদেহীপুত্রঃ বর্ষকারং (তন্নামধেয়ং) ব্রাহ্মণং মগধমহামাত্যং (মগধ-রাজ্যস্য প্রধানসচিবং) আমন্ত্রয়তি স্ম (আহূতবান্)।

পা—এহি ত্বাং ব্রাহ্মণ যেন ভগবা তেন উপসংকমি।

সং—এহি ত্বং ব্রাহ্মণ, যত্র ভগবান্ (বুদ্ধদেবঃ বিহরতি) তত্র উপসংক্রামসি (গচ্ছ)।

পা—উপসংকমিত্বা মম বচনেন ভগবতো পাদে সিরসা বন্দাহি।

সং—উপসংক্রম্য (গত্বা) মম বচনেন (মদ্বচনং কথয়িত্বা) ভগবতঃ পাদৌ শিরসা বন্দস্ব।

পা—অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছ।

সং—অল্পাবাধং (অল্পং আবাধং পীড়া ইতি, নীরোগং) অল্পাতঙ্কং (অল্পং আতঙ্কং ভয়ং যন্ত্রণা ইতি শেষঃ স্বাচ্ছন্দ্য-মিত্যর্থঃ) লঘুস্থানং (অনায়াসস্থিতিং) বলং সুখবিহারং (ফাসু সুখম্) পৃচ্ছ।

পা—রাজা ভন্তে মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতি।

সং—তত্রভবান্ রাজা মাগধোঽজাতশত্রুর্বৈদেহীপুত্রঃ ভগবতঃ পাদৌ শিরসা বন্দতে।

পা—অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্‌ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছতীতি।

সং—অল্পাবাধম্ অল্পাতঙ্কং লঘুত্থানং বলং সুখবিহারং পৃচ্ছতীতি।

পা—এবঞ্চ পন বদেহি রাজা ভন্তে মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জি অভিযাতুকামো।

সং—এবঞ্চ পুনর্বদতি তত্রভবান্ রাজা মাগধোঽজাতশত্রু বৈদেহীপুত্রঃ বৃজিনোঽ ভিযাতুকামঃ।

পা—সো এবমাহ অহম্ ইমে বজ্জি এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে উচ্ছেজ্জামি বজ্জি বিনাসেস্সামি বজ্জি অনয়ব্যসনং আপাদেস্সামি।

সং—স এবমাহ অহমিমান্ বৃজিনঃ এবং মহর্দ্ধিকান্ এবং মহানুভাবান্ উচ্ছেৎস্যামি বৃজিনো বিনাশয়িষ্যামি বৃজিনোঽ নয়ব্যসনমাপাদয়িষ্যামি।

পা—যথা চ তে ভগবা ব্যাকরোতি তং সাধুকং উগ্‌গহেত্বা মম আরোচেয্যাসি।

সং—যথা চ তব (সকাশে) ভগবান্ ব্যাকরোতি (কথয়তি) তৎ সাধু (সম্যক্) গৃহীত্বা (শ্রুত্বা স্মৃত্বা চ) মাং আবেদয়িষ্যসি (কথয়িষ্যসি)।

পা—ন হি তথাগতা বিতথং ভনন্তীতি।

সং—ন হি তথাগতাঃ (তথা যেন পুনরাবৃত্তির্নভবতি তৎ গতং জ্ঞাতং যৈস্তে; বুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ) বিতথং (বিগতং তথ্যং যস্মাৎ তৎ মিথ্যাং) ভণন্তীতি বদন্তীতি।

পা—এবম্ভোতি খো সো বস্সকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামাত্তো রঞ্ঞো মাগধস্স অজাতসত্তুস্স বেদেহিপুত্তস্স পটিস্সুত্বা ভদ্দানি ভদ্দানি যোজাপেত্বা ভদ্দং যানং অভিরুহিত্বা ভদ্দেহি ভদ্দেহি যানেহি রাজগহা নীয্যাসি।

সং—এবং ভবতি খলু সঃ বর্ষকারো ব্রাহ্মণঃ মগধমহামাত্যঃ রাজ্ঞঃ মাগধস্য অজাতশত্রোর্বৈদেহীপুত্রস্য (বাক্যং) প্রতিশ্রুত্য ভদ্রাণি ভদ্রাণি (যানানি) যোজয়িত্বা ভদ্রং যানং আরুহ্য ভদ্রেণ ভদ্রেণ যানেন রাজগৃহে নীতবান্ (আত্মানমিতিশেষঃ)।

পা—যেন গিজ্‌ঝকুটো পব্বতো তেন পায়াসি।

সং—যত্র গৃধ্রকূটপর্ব্বতস্তত্র প্রায়াৎ।

পা—যাবতিকা যানস্স ভূমি যানেন গন্ত্বা যানা পচ্চারোহিত্বা পত্তিকোঃ যেন ভগবা তত্ত উপসঙ্কমি।

সং—যাবতিকা যানস্য ভূমি তাবৎ যানেন গত্বা যানাৎ প্রতিরুহ্য পদাভ্যামেব যত্র ভগবান্ তত্র উপসংক্রামতি স্ম।

পা—উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি।

সং—উপসংক্রম্য ভগবতা সার্দ্ধং (সাক্ষাৎকারেণ ইতি-ভাবঃ) সম্মোদং চকার (হর্ষং প্রকাশয়ামাস)।

পা—সম্মোনীয়ং কথং সারণিয়ং বিতি সারেত্বা একমন্তং নিসীদি।

সং—সম্মোদনীয়াং (হর্ষজ্ঞাপকাং) কথাং (বাক্যং উক্ত্বা) স্মরণীয়াঞ্চ (মগধরাজেনোক্তাং তেন আদিষ্টাং বা) কথাং স্মৃত্বা একমন্তং (একপার্শ্বে) নিষীদতি স্ম (উপবেশয়ামাস)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবান্ অর্হৎকে নমস্কার।

আমি এইরূপ শুনিয়াছি। একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব রজগৃহস্থিত গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিগণকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ বলিলেন, 'আমি এই সমৃদ্ধিশালী পরাক্রান্ত বৃজিগণের উচ্ছেদ ও বিনাশ সাধন করিব ও তাহাদিগের বিপৎকর দুঃখ আনয়ন করিব।' অনন্তর বৈদেহীপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু মগধের প্রধান সচিব বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন। (তিনি বলিলেন), "হে ব্রাহ্মণ, আইস, যথায় ভগবান্ বুদ্ধদেব আছেন তথায় যাও। তাঁহার নিকট গিয়া আমার হইয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার বন্দনা কর। তাঁহাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাময়, এবং সুস্থশরীরে সুখে বিহার করিতে পারিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিবে। (তাঁহাকে বলিবে) 'মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু আপনার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া বন্দনা করিতেছেন। আপনি নীরোগ ও স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছেন কিনা এবং সুস্থ শরীরে বিহার করিতে পারিতেছেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি আরও কহিলেন যে, তিনি বৃজিজাতিকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি কহিলেন, 'আমি এই মহাসমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত

বৃজিগণের উচ্ছেদ ও বিনাশ সাধন করিব এবং তাহাদিগের বিপৎকর দুঃখ আনয়ন করিব।'

ভগবান্ বুদ্ধদেব তোমার নিকট যাহা কহেন তাহা সম্যক্ স্মরণ পূর্ব্বক আমাকে আসিয়া কহিবে। বুদ্ধেরা মিথ্যাবাক্য কহেন না।"

এইরূপ কথোপকথন হইলে পরে মগধের প্রধান অমাত্য বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণ মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎকৃষ্ট যান সকল যোজনা করতঃ তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজগৃহে গেলেন। যথায় গৃধ্রকূট পর্ব্বত তথায় গমন করিলেন। যানে গমনোপযোগী স্থান পর্য্যন্ত যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবতরণ করিয়া যথায় বুদ্ধদেব ছিলেন তথায় পদব্রজে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতে হৃষ্ট হইলেন এবং হর্ষজ্ঞাপক বাক্য উচ্চারণ ও রাজার আদিষ্ট কথা স্মরণ করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

মাতাজী তপস্বিনী।

অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, যে জনৈক তপস্বিনী "মহাকালী পাঠশালা" নামক বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। এদেশের সাধুতপস্বীগণ সাধারণতঃ জনসংসর্গ-বিমুখ, সংসারত্যাগিনী নারী হইয়াও ইনি পরম লোকহিতকর স্ত্রীশিক্ষাকার্য্যে এত মনোযোগী হইয়াছেন জানিয়া দূর হইতেই ইঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। সেদিন আমি ইঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া এবং ইঁহার বিবরণ শুনিয়া বাস্তবিকই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি।

মাতাজী তপস্বিনীর বিস্তৃত জীবনচরিত সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আপন জীবনের ঘটনাবলী কখন কখন কাহারো নিকট কিছু কিছু বলিয়া থাকেন। আমি নিজে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে এবং বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিয়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

মাতাজীর জন্মকাল জানিতে পারিলাম না। বয়সে প্রৌঢ়া বলিয়া মনে হয়। দেখিতে অতিশয় সুন্দরী।

শুনিলাম দাক্ষিণাত্যে, দ্রাবিড় দেশে, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। মাতুলগণ ধনী জমিদার ছিলেন। বাল্যকালে পিতৃগৃহে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মে। তপশ্চর্য্যার জন্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি নৈমিষারণ্যে চলিয়া যান। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন। কি প্রকারে জানি না, উত্তর ভারতের অনেক বড় বড় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী মাতাজীর সংসর্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও শক্তি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; তাঁহাদের পত্নীগণও মাতাজীকে প্রায়ই দর্শন করিতে আসিতেন।

নৈমিষারণ্য হইতে মাতাজী গঙ্গাস্নান করিতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম পরলোকগতা মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী যখন কাশিমবাজারের জমিদারী উত্তরাধিকার করেন তখন মাতাজী কাশিমবাজারে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের বিধবারাণী বসন্তকুমারীর সহিত রাজা দক্ষিণারঞ্জনের বিবাহের সময়ও তিনি এই অঞ্চলেই ছিলেন। হাইকোর্টের বাঙ্গালী জজ ৺শম্ভূনাথ পণ্ডিত ও ৺দ্বারিকানাথ মিত্র উভয়েই মাতাজীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন।

বঙ্গদেশ হইতে পশুপতিনাথ দর্শনের জন্য মাতাজী নেপাল গমন করেন। সেখানে তিনি বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা ও প্রধান প্রধান পদস্থ লোকগণও মাতাজীকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। নেপালে তিনি গঙ্গাদেবীর এক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মন্দির নাকি এখন নেপালে এক বিখ্যাত দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। নেপালে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করাইয়া তিনি নাকি চারি বেদ সুবর্ণাক্ষরে লেখাইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন।

প্রায় ১৭ বৎসর হইল মাতাজী তপস্বিনী বঙ্গদেশে

দ্বিতীয় বার পদার্পণ করিয়াছেন। হিন্দু ধর্মে অবশ্যই তিনি গভীর নিষ্ঠাবতী। কিন্তু বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দু ধর্মে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। এদেশে ধর্মবন্ধন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্যই তিনি তের বৎসর হইল "মহাকালী পাঠশালা" স্থাপন করিয়াছেন। "মহাকালী পাঠশালা" এখন এদেশে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা, হাওড়া, বহরমপুর, কাশী, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি দশ বারটী স্থানে এই পাঠশালার শাখা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বালিকা এই সকল পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিতেছে। একটী নারীর এইরূপ কার্য্যকারিণী শক্তি দেখিয়া কে না বিস্ময়ে অভিভূত হয়। সাধারণের সাহায্যে এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু আয় ব্যয়ের বিবরণীতে দেখিতেছি, কখন কখন সহস্রাধিক টাকা মাতাজীকে বিদ্যালয়ের জন্য নিজ তহবিল হইতে দিতে হয়। সন্ন্যাসিনী এই অর্থ কোথায় পান, জানি না। তবে ইঁহার মত তপস্বিনীদের অর্থাভাব না হইবারই কথা। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের এই চেষ্টার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।

মাতাজী চিরকৌমার-ব্রতধারিণী। তিনি একাকী ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। সাহস, কর্ম্মোৎসাহ, পরিশ্রম, চিন্তাশীলতা ও তপস্যায় এদেশের অতি অল্প পুরুষই এই মনস্বিনী হিন্দুনারীর সমকক্ষ হইবার যোগ্য। একাকী নির্ভয়ে তিনি জনকোলাহলময় মেলা স্থলে ও বিন্ধ্য হিমাচলাদির নির্জ্জন কন্দরে ভ্রমণ করিয়াছেন। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে এই সন্ন্যাসিনী অশ্বারোহণে বিশেষ পটু। উৎকৃষ্ট ইংরেজ অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহণে তিনি জয়ী হইয়াছেন। একদিকে এই সকল পুরুষোচিত গুণ, অন্যদিকে রমণীজনোচিত ললিত-কলায়ও ইনি বিশেষ পারদর্শী। বেদ-বেদান্ত ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে শুনিয়াছি, ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। ইঁহার স্বহস্তাঙ্কিত মনোরম চিত্রাবলী, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবর্ষে এখনও প্রাচীন তন্ত্রের এমন রমণীরত্ন আছেন, জানিতাম না।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

গার্হস্থ্য কথা।

আম্র রক্ষার উপায়।

ডাকর (আধপাকা) আম বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া উহার বোঁটা মোমদ্বারা ঢাকিয়া দিয়া একটী ছোট ঘৃতের বা কেরোসিনের টিনে আমগুলি ভরিয়া টিনের মুখ দস্তা দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। তৎপর টিনটী একটী শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত আম্র অবিকৃত থাকে। টিনের মুখ খুলিলে এক দিনের বেশী আর আমগুলি টাট্‌কা থাকে না। এক দিনের পরেই পচিতে আরম্ভ করে। টিনের মুখ খুলিয়া আম বাহির করিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলি পুনরায় ঐভাবে রাখিয়া দেওয়া চলে। কিন্তু একবার খুলিবার পর দুই মাসের বেশী টিনের আমগুলি ভাল থাকে না এবং তেমন স্বাদও থাকে না। উক্ত প্রকারে রক্ষিত আমগুলি বিস্বাদ হয় না, ঠিক টাট্‌কা বলিয়া বোধ হয়। খাইবার পূর্ব্বে শীতল জলে ধুইয়া লইতে হয়।

উক্ত প্রকারে টিনে আমগুলি ভরিয়া তাহাতে মধু ঢালিয়া দিয়া টিনের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে ৯।১০ মাস কাল আম টাট্‌কা থাকে। কিন্তু এই প্রকারে রাখিলে আমের স্বাদ একটু বিকৃত হইয়া যায়।

অপক্ক অবস্থায় আম পাড়িয়া উহার বোঁটা গালা দিয়া বন্ধ করতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত আম ব্যবহারোপযোগী রাখা যায়।

গৃহিণীরা সাধারণতঃ সরিষার তৈলে বা মধুতে আম ফেলিয়া রাখেন। এই উপায়ে ৫।৬ মাসের বেশী আর থাকে না, অথচ এই সময়ের মধ্যে উহার স্বাদ সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যায়। (সঙ্কলিত।)

মাতৃস্তন্য।

শিশুর প্রধান আহার মাতৃদুগ্ধ; সেই দুগ্ধ নির্দ্দোষ হইলে শিশু সুস্থ থাকে কিন্তু দূষিত দুগ্ধ পান করিলে শিশু

রোগগ্রস্ত হয়। মাতৃদুগ্ধ সেবনোপযোগী কিনা, এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সকল গৃহস্থেরই জ্ঞান থাকা উচিত।

যে দুগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, যাহা অবিবর্ণ এবং যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় পদার্থ পরিলক্ষিত না হয়,—এইরূপ স্তনদুগ্ধই বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। মাতা বা ধাত্রী শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্ত, ব্যাধিমতী, অতীব কৃশা, গর্ভিণী, জ্বরগ্রস্তা, অজীর্ণরোগপীড়িতা এবং অপথ্যসেবিনী হইলে তাহার স্তনপানে শিশু রুগ্ন হইয়া থাকে। আজকাল অনেক গর্ভধারিণী অজীর্ণ রোগে কষ্ট পান, তাঁহাদের বুকজ্বালা, অম্লোদগার, চোঁয়া ঢেকুর, পেটে বায়ুজনিত কুজনধ্বনি এবং উদরাময় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতের দোষ এবং অজীর্ণ রোগ থাকিলে সেই মাতার স্তনদুগ্ধ শিশুর ব্যবহারোপযোগী নহে। মাতৃদুগ্ধ না পাইলে শিশুকে ছাগীদুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। যে ছাগী চরিয়া বেড়াইতে পায়, তাহার ধারোষ্ণ দুগ্ধ শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ছাগীকে এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার দুগ্ধে অপকার হইবার সম্ভাবনা।

মহারাষ্ট্র দেশে শিশুদিগকে মাতৃদুগ্ধের বা ধাত্রীদুগ্ধের অভাবে ছাগীর স্তন হইতে দুগ্ধ পান করাইতে শিখান হয়। অনেক ছাগীর এমন অভ্যাস হইয়া যায়, যে শিশুর পান করিবার সময় হইলে সে আপনি আসিয়া বালকের নিকট উপস্থিত হয়। অনেকেই মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুকে গর্দ্দভী দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। কিন্তু এইটী মনে রাখা উচিত যে, গর্দ্দভীর দুগ্ধের পোষণশক্তি মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক কম। গর্দ্দভীর দুগ্ধ দ্বিগুণ পরিমিত পান করাইলে তবে কিয়ৎপরিমাণে মাতৃদুগ্ধের সমান কাজ হয়। এইরূপ পরিমাণে গর্দ্দভীদুগ্ধ পান করান অনেক ব্যয়সাধ্য।

আমাদের এ দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তাহাদিগকে গাভী দুগ্ধ পান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের ৩।৪ দিন পরে মাতার স্তনে দুগ্ধ আইসে। প্রকৃতি মাতৃস্তনে দুগ্ধ আনিতে যেমন বিলম্ব করেন, তেমনি সন্তানেরও সেই ৩।৪ দিন পরিপাক করিবার শক্তি ভাল বিকাশ পায় না। এই ৩।৪ দিন মাতৃদুগ্ধের অভাবে গাভীদুগ্ধ পান করান অনাবশ্যক, এই সময়ে শিশুকে অল্প অল্প মধু পান করাইলেই যথেষ্ট হয়।

গোদুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক গুরুপাক। শিশুকে গাভীদুগ্ধ পান করাইতে হইলে দুগ্ধের সহিত মৌরির জল, বার্লিসিদ্ধ জল বা এরারুটসিদ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করান উচিত। দুগ্ধ শিশুর উদরে উপস্থিত হইবামাত্র ছানা বাঁধিয়া যায়। মাতৃদুগ্ধের ছানা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং গোদুগ্ধের ছানা অপেক্ষা অনেক বড়। বার্লিসিদ্ধ জল বা এরারুট সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধে ছানা এত বড় হয় না। ছানা বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত হইলে শীঘ্র পরিপাক পায় না। (সঙ্কলিত।)

—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের সাম্বৎসরিক— ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টের শুভদিনে বাঙ্গালী যথাসম্ভব বিদেশীয় পণ্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। গত ৭ই আগষ্ট এই মঙ্গলানুষ্ঠানের সম্বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গে মহা আড়ম্বরে এই অনুষ্ঠানের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই দিন বাঙ্গালী নূতন করিয়া আবার স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়াছে। কলিকাতার মহাসভায় দেশপূজ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় বিংশতি সহস্র লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় স্বদেশার্থে উৎসর্গীকৃতজীবন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি বঙ্গবাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নেতৃগণ যথোচিতরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর জাতীয় পতাকা নাই। সে দিনের সভায় হিন্দুর সূর্য্য ও মুশলমানের অর্দ্ধচন্দ্র এবং আটটী পদ্মফুল—এই চিহ্নাঙ্কিত একটী জাতীয় পতাকা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞার ফলে দেশের মৃতপ্রায় শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে; বিলাতের বস্ত্রশিল্পীগণ এখন স্বীকার করিতেছেন, যে তাঁহাদের বস্ত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিয়া গেলে বিধাতার আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর অবশ্যই বর্ষিত হইবে। সম্মুখে পূজার বাজার, মহা প্রলোভন।

আমরা সকলকে এ সময় স্বদেশীব্রতে দৃঢ় হইতে অনুরোধ করিতেছি।

লাট ফুলারের পদত্যাগ—আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণকে জ্বালাতন করিয়া লাট ফুলার অবশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজরাজ্যে তাঁহার মত অল্পবুদ্ধি ও উৎপীড়ক শাসনকর্ত্তা আর দেখা যায় না। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, ষ্টেট্ সেক্রেটরী ও গবর্ণর জেনারেল তাঁহার এই অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারিলেন না বলিয়া মনোদুঃখে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতদ্বেষী ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি বলিতেছে, বাঙ্গালীর আন্দোলনের ফলেই এই পদত্যাগ ঘটিল। ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটরী ও গবর্ণর জেনারেল এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ইহারা তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া নিন্দা করিতেছে। যাহা হউক এই ভাবে এদেশে ইতিপূর্ব্বে আর কোন ছোট লাট কর্ম্মত্যাগ করেন নাই। ব্রিটিস পার্লামেন্টের যে সকল ভারতহিতৈষী সভ্য পূর্ব্ববঙ্গে ফুলার সাহেবের অত্যাচারের প্রতি ইংরেজ সাধারণের ও ষ্টেটসেক্রেটরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের একান্ত ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ভারতের জন্য এত শ্রম না করিলে ফুলার সাহেবের পদত্যাগ ঘটিত কি না সন্দেহ। ভারতবন্ধু সার হেনরী কটন এ জন্য বিশেষ ভাবে আমদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বাঙ্গালার অস্থায়ী ছোট লাট শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের নূতন ছোট লাট হইলেন। অক্টোবর মাসে স্থায়ী ছোট লাট ফ্রেজার সাহেব ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত মিষ্টার শ্লেক বাঙ্গালার ছোট লাটের কার্য্য করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদ্রোহ—কত বৎসর হইল পররাজ্যলোলুপ ইংরেজগণ দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ট্রান্সভাল, নেটাল প্রভৃতি দেশ এখন ইংরেজের উপনিবেশে পরিণত। কিন্তু অসভ্য জুলু প্রভৃতি আদিম অধিবাসীগণ এখনও অপহৃত স্বাধীনতা পুনর্লাভের জন্য সময় সময় ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। কিছুদিন হইল জুলুবীর বাম্বাটার অধীনে এক দল আদিম অধিবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। বলা বাহুল্য প্রতাপান্বিত ইংরেজের

জুলু-বীর বাম্বাটা।

বিরুদ্ধে সে চেষ্টা বিফল হইতেছে। কিন্তু নেটাল গবর্ণমেণ্টকেও এই বিদ্রোহে প্রমাদ গণিতে হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহারা এই বিদ্রোহ দমন করিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম বেষ্টন করিয়া ইংরেজগণ স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকানির্ব্বিশেষে গ্রামবাসীগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে। বীরবর বাম্বাটা ইহাদের হস্তে ধৃত ও নিহত হইয়াছেন। ইংরেজগণ ইঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া জুলুদিগের নিকট প্রদর্শন করিয়াছে। ইংরেজের এত পখাচার, এত পাপাচারের জন্য কি নিদারুণ শাস্তি ভবিষ্যতের গর্ভে লুকায়িত আছে, ভগবান জানেন।

জাপানে নারীর উচ্চশিক্ষা—ভারত-মহিলার পাঠক পাঠিকাগণ জাপানের স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় অবগত আছেন। গত তিন বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রীগণকে উপাধি দেওয়া হইতেছে। গত তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবসভায় (convocation) ১৩৪ জন মহিলাকে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

৭২(A)

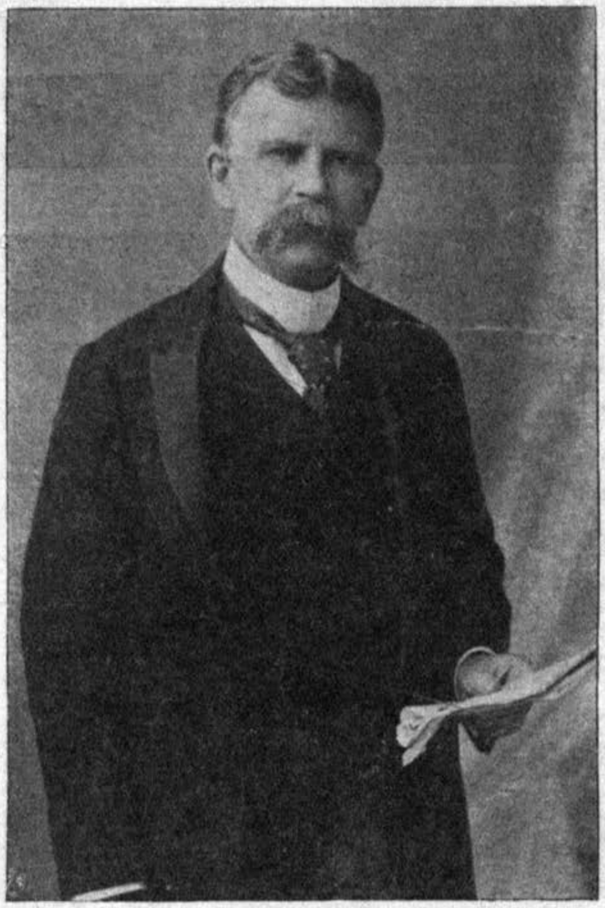

ভারতবন্ধু সার হেনরি কটন।

BENGAL LIBRARY
19.SEP.1906
WRITERS' BUILDINGS

৭২(A)

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

চেরি প্রেস—কলিকাতা।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

BENGAL ... 6. MAR. 1908

২য় ভাগ। আশ্বিন, ১৩১৩। ২য় সংখ্যা।

ঋগ্‌বেদের দেবতাগণ।

আজ কাল লোকে ৩৩ কোটি দেবতার কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ঋগ্‌বেদে কেবল ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিরণ্যস্তূপ ঋষি অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বলিতেছেন ঃ—

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং
মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নীরপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো
ভবতং সচাভুবা॥
১ম ৭ অ ৩৪ সূ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা ত্রিগুণিত একাদশ অর্থাৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণের সহিত মধুর সোমপান করিতে, এই যজ্ঞস্থানে আগমন করুন, আমাদিগের আয়ু বৃদ্ধি করুন, আমাদিগের পাপ শোধন করুন, এবং দ্বেষ-কারক রিপুগণকে নিবারণ করুন ও আমাদিগের সহিত সহায়রূপে স্থিতি করুন।

সায়নাচার্য্য বলেন, দ্যুলোকের একাদশ, অন্তরিক্ষ লোকের একাদশ এবং ভূলোকের একাদশ এই সমুদয়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ। ঋগ্‌বেদের ৩।৬।৯ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ— "হে অগ্নে, ৩৩ সংখ্যক দেবগণকে তৎপত্নীদিগের সহিত আনয়ন কর।" কিন্তু যদিও প্রথমে কয়েক স্থানে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে, তথাপি ঋগ্‌বেদেই এই সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের ৯ম সূক্তের ৯ম ঋকে আছে ঃ—"ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসর্পয়ন্।"—তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ এবং নয় দেবগণ অগ্নির উপাসনা করিলেন।

পৌরাণিক কালে তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতা কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, এক প্রজাপতি এবং এক বষট-কার, এই তেত্রিশ। আদিম সময়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না, সুতরাং লোকের মন বড়ই কল্পনাপ্রিয় ছিল। বোধ হয় আর্য্যাবর্ত্তে যত লোক বাস করিত, পৌরাণিক সময়ে প্রত্যেকেরই এক এক স্বতন্ত্র উপাস্য দেবতা কল্পিত হইয়াছিল। সুতরাং তেত্রিশ কোটি দেবতার আবশ্যক হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল ঋগ্‌বেদের দেবতাগণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম কোন কোন

বিষয়ে ঋগ্বেদের অনুযায়ী বটে, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় অনার্য্যদিগের ধর্ম্ম হইতে অনেক মত গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সকল দেবতার উপাসনা বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা এস্থলে কিছু বলিতে চাই না।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে বৈদিক দেবতাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত বিশ্ব স্বর্গ, অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবী এই তিন ভাগে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক বিভাগে এগার জন দেবতা ছিলেন। স্বর্গীয় দেবতাদিগের মধ্যে দ্যৌঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিলেন। তাঁহার গ্রীক নাম জিয়স্ (Zeus)। দ্যৌঃ আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; দিব্ (দীপ্তি পাওয়া) ধাতু হইতে এই নাম গঠিত। অনেক স্থলে তাঁহাকে পিতা বলা হইয়াছে। এক স্থলে 'দ্যৌষ্পিতা জনিতা' নামে তিনি অভিহিত হইয়াছেন। সায়নাচার্য্যের মতে ইহার অর্থ এই, যে দ্যৌঃ অগ্নির পালয়িত্রী এবং জনয়িত্রী। কিন্তু প্রায়ই দ্যৌঃ এবং পৃথিবী "দ্যাবাপৃথিবী" নামে একত্র অভিহিত হইয়াছেন। এক স্থলে দ্যৌঃকে মুক্তাভূষিত কৃষ্ণ অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা যে রাত্রিকালীন নক্ষত্র-ভূষিত আকাশের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি লোহিতবর্ণ বৃষ, পৃথিবীর অভিমুখে গর্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি বজ্রধারী।

কালক্রমে জিয়স গ্রীকদিগের প্রধান দেবতা হইলেন, কিন্তু দ্যৌঃ ভারতবর্ষে কখন সেইরূপ উন্নত স্থান অধিকার করেন নাই। তাঁহার পুত্র ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিলেন। দ্যৌঃ নিজপুত্রের নিকট অবনত হইলেন। কারণ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক অপেক্ষাও অধিক।

অস্মদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্তরিক্ষাৎ।
স্বরাড়িন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়॥
১।৬১।৯।

স্বর্গীয় দেবতাদের মধ্যে বরুণ দ্যৌঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদের বরুণ আর গ্রীক-দিগের Ouranos এক। গ্রীক লেখক হিসিয়ড (Hesiod) আউরানস্ শব্দ আকাশ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সমস্ত আচ্ছাদন করেন এবং যখন রাত্রি আনয়ন করেন তখন সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেন। ইহা হইতে বোধ হয়, যে গ্রীকেরা হিসিয়ডের সময়ে আউরানস্ শব্দের মৌলিক অর্থ বিস্মৃত হন নাই। বরুণ ও আউরানস্ সংস্কৃত বর্ (আবৃত করা) ধাতু হইত গঠিত। ঋগ্বেদে বরুণ আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রাত্রির সঙ্গে বিশেষরূপে সম্বদ্ধ। অতএব মিত্রদেব অর্থাৎ দিবসের বিপরীত। শার্ম্মণ্য দেশীয় কৃবিদ্গণ আরো বলেন, যে ঋগ্বেদের বরুণ এবং আবেস্তায় উল্লিখিত আহুরা-মজ্দা এক।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে দ্যৌঃ দ্যোতনশীল আকাশ; বরুণ সর্ব্ব-ব্যাপী বিস্তৃতি, উজ্জ্বল আকাশের আধার এবং সকল বস্তুর উৎপত্তি স্থল।

স ক্ষপঃ পরি ষস্বজে ন্যুস্রো মায়য়া দধে স বিশ্বং পরি দর্শতঃ।
তস্য বেনীরনু ব্রতমুষস্তিস্রো অবর্ধয়ন্নভংতামন্যকে সমে॥

বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন, অপি চ দর্শনীয় বরুণ উৎসরণশীল হইয়া বিশ্বকে মায়ারূপ কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে আচ্ছাদন করেন। কামায়মান প্রজাগণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে বরুণের ব্রত করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রের পর যে বরুণই প্রাচীন আর্য্যদের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীনকালে যখন আর্য্যগণ মধ্য আসিয়ায় একত্র বাস করিতেন, সম্ভবতঃ তখন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে বরুণ নামে আহ্বান করিতেন। ঋগ্বেদে বরুণের প্রতি যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, বরুণ জগতের শাসনকর্ত্তা এবং পাপ হইতে মুক্তিদাতা। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, রাজরাজেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ আত্মা। ন্যায়পরায়ণতা (justice) এবং দয়া তাঁহাতে সমভাবে বর্ত্তমান। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের নিকট পশ্বাদি সাংসারিক ধন প্রার্থনা করা হইত, বরুণের নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করা হইত। এস্থলে একথা স্বীকার্য্য, যে যদিও ঋগ্বেদের বহুস্থলে পশু, দীর্ঘায়ু, পুত্র এবং সাংসারিক সুখপ্রদ অন্যান্য বস্তু প্রার্থনা করা হইত, তথাপি পাপের জ্ঞান এবং ক্ষমাপ্রার্থনাও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। ১।১৮৮ ঋকে গৌতমনোধা ঋষি অগ্নির কাছে পাপ সম্বন্ধে

এই কথা বলিতেছেন ঃ—অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো নপাৎ পূর্ভিরায়সীভিঃ॥ হে ঘর্ষণদ্বারা উৎপন্ন অগ্নিদেব, আপনার স্তবকারীকে দৃঢ়তর প্রাকারদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ বরুণকে বিশেষ ভাবে পাপের ক্ষমাকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি নৈতিক জগৎ ও মানুষের বিবেকের নেতা। তাঁহার ব্যবস্থা অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহারা পাপাচরণ করে এবং বেদবিহিত ব্যবস্থানুসারে তাঁহার উপাসনা করে না, তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিয়া থাকেন।

মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ।১।২৫।২।

তথাপি পাপীর প্রতি তিনি দয়াশীল। এই কারণে পাপে জর্জ্জরিত মনুষ্য বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে ঃ—

মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥
য দেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥
যৎকিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেন সো দেব রীরিষঃ॥

হে বরুণ, আমি যেন এখন মৃন্ময় গৃহে প্রবেশ না করি, (কিন্তু তোমার সুশোভন সুবর্ণময় গৃহে যেন প্রবেশ করিতে পারি)। কৃপা কর, হে সর্ব্বশক্তিমান্, কৃপা কর।

যদি আমি তোমার ভয়ে বায়ুবিতাড়িত মেঘের ন্যায় কম্পমান হইয়া চলি, দয়া কর, হে সর্ব্বশক্তিমান, দয়া কর।

হে বলশালী এবং নির্ম্মল বরুণ, শক্ত্যভাবে আমি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অবহেলা করিয়াছি; দয়া কর, হে সর্ব্ব-শক্তিমান, দয়া কর।

জলে অবস্থিতি সত্ত্বেও তোমার স্তোতার তৃষ্ণা হইয়াছিল; দয়া কর, হে সর্ব্বশক্তিমান, দয়া কর।

হে বরুণ, যখনি আমরা দেব সমূহের বিরুদ্ধে পাপ করি, যখনি আমরা অসতর্কতা বশতঃ তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করি, আমাদিগকে শাস্তি দিও না।

বাস্তবিক ঋগ্‌বেদে আর কোন দেবতাতেই এত মহৎ গুণ এবং শক্তি আরোপ করা হয় নাই। তিনি স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার মায়া নামক অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞান আছে, সর্ব্বত্র তিনি দূত পাঠাইয়া থাকেন, পাপ ঘৃণা করেন। পাপিদিগকে পাশবদ্ধ করিয়া শাস্তি দেন, পাপ ক্ষমা করেন; তিনি মনুষ্যদিগকে অমৃতত্ব দান করেন। সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, স্বর্গ তাঁহার আচ্ছাদন, তিনি সমস্ত প্রাণিজগতের ধারণকর্ত্তা, তিনি দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে নক্ষত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্রত অর্থাৎ আদেশ পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তাঁহার আদেশেই রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হয় এবং প্রভাতে নক্ষত্রগণ তিরোহিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। তিনি দেখিতে সুশ্রী, অজর, অজেয়, প্রবল ঝড়েতেও অবিচলিত। অজ্ঞ লোকেরা তাঁহার নিকট জ্ঞান পায়; তাঁহাতে কোন প্রবঞ্চনা নাই। তাঁহার উপাসকেরা ঐশ্বর্য্য ও সুখ লাভ করিয়া থাকে। তিনি স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং তথা হইতে অন্তরিক্ষে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ ও মহাসমুদ্রে ভাসমান জাহাজ সকল দেখিতে পান। তিনি বায়ুর গতি এবং স্বর্গস্থ পরাক্রান্ত দেবতাদিগকে জানেন। অন্ধকার তাঁহার কাছে আলোর ন্যায় দীপ্তি পায়, কারণ কি করা হইয়াছে, এবং কি করা হইবে তৎসমস্ত তিনি দেখেন।

অ তো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাং অভি পশ্যতি।
কৃতানি যা চ কর্ত্বা॥ ১।২৫।১১।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, যে বরুণকে প্রচীন ঋষিগণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ক্রমে সেই বিশ্বাস লোপ পাইয়াছিল। ঋগ্‌বেদেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋষিগণ প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে লাগিলেন; সর্ব্বজ্ঞ বরুণ সিংহাসনচ্যুত হইয়া আদিত্য নামক নিকৃষ্ট দেবতাদের মধ্যে গণ্য হইলেন। ইন্দ্র তাঁহার স্থলে উন্নীত হইলেন। অনেক স্থলে ইন্দ্র ও বরুণের নাম একত্রে উল্লিখিত দেখা যায়।

ঋগ্‌বেদে বরুণকে সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয় নাই। তথাপি অন্তরিক্ষ প্রদে-

শের জলের সঙ্গে তাঁহার সংশ্রব আছে। ঋগ্‌বেদে ৭।৬৪।২ ঋকে বরুণকে সিন্ধুপতি বলা হইয়াছে। সুতরাং পৌরাণিক সময়ে তিনি ভারতীয় নেপচিউন (Neptune) অর্থাৎ জলাধিপতি হইলেন। মহাভারত মতে বরুণ কর্দমের পুত্র এবং পুষ্করের পিতা। মহাভারতে কোন স্থলে দেব-গন্ধর্ব্ব, কোন স্থলে নাগ, কোন স্থলে বা নাগদিগের রাজা এবং অসুররূপে বরুণ বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি পশ্চিম-দিক্‌পাল। অতি প্রাচীন বৈদিক সময়ে তিনি আর্য্য ঋষিদের মতে সমস্ত জগতের ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু এই বিশুদ্ধ মত ক্রমে ভ্রান্তিতে জড়িত হইল এবং পৌরাণিক সময়ে বরুণ কল্পনাসৃষ্ট দেবতাদের মধ্যে অতি নিম্ন স্থানে অবনত হইলেন। শ্রীরাজকুমারী দাস।

স্নেহময়ী।

মায়ের বাণী ওই বুঝি
সন্ধ্যাবায়ে শোনা যায়,—
করুণ সুরে পশে কাণে
"আয়রে তোরা কোলে আয় ;"
আয়রে ঘরে ফিরে' সাঁঝে,
সারাটি দিন বৃথা কাজে
কেমন করে ভু'লে ছিলি
এমন স্নেহময়ী মায় !
মায়ের বাণী ওই ভাই,
সন্ধ্যাবায়ে শোনা যায়।

নদীর জলে বহে সদা
মায়ের স্নেহ সুধাধারা
মায়ের স্নেহ-ছায়া তলে
জুড়ায় দেহ গেহহারা।
আম্রবনে বটমূলে,
দীঘির ঘাটে নদীকূলে,
আঁচল খানি পাতা তাঁর
শ্যামল শত বিছানায়,
কেমন করে ভু'লে ছিলি
এমন স্নেহময়ী মায় !

মায়ের দ্বারে গান করে
মধুর সুরে কত পাখী,
ভোর না হ'তে জেগে' তারা
হরষভরে উঠে ডাকি।
হাস্যময়ী ঊষারাণী
পূজিতে মা'র পা দুখানি
কুসুম ডালা লয়ে আসে,
নিত্য তাঁর আঙিনায়।
কেমন ক'রে ভু'লে ছিলি
এমন স্নেহময়ী মায় !

মায়ের বনে তরুরাজি
ফলের ভারে অবনত,
সোণার ক্ষেতে মাঠে মাঠে
শস্য ফলে' আছে কত।
অভাব কিবা আছে মা'র ?
শ্রেষ্ঠ ফুল-ফল-ভার
ছয়টি ঋতু ঘুরে ঘুরে
অর্ঘ্য দিয়ে যায় পায়।
কেমন করে ভু'লে ছিলি
এমন স্নেহময়ী মা'য় !

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে।

বহুদিন হইতে আর্য্যবীরগণের পবিত্র রণস্থল দর্শন করিবার লালসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহা সফল হইল। আষাঢ়ের শেষে একদিন ভোর ৪॥০ টায় নর্থ-ওয়েষ্টারণ রেলওয়ের মেইল ট্রেণে আমরা শাহারাণপুর হইতে যাত্রা করিলাম।

ঊষার বিমলালোকে ট্রেণখানি সবেগে ধাবিত হইল। তখনও জগত সম্যকরূপে জাগরিত হয় নাই, অনেকেই সবিতৃদেবের পূর্ণ আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। বিহঙ্গম-গণ কুলায় হইতে স্বচ্ছ নয়ন দুটি মেলিয়া সুপ্ত সংসারের পানে চাহিয়া চাহিয়া আবার নীরবে তাহা মুদ্রিত করি-

তেছে। আকাশে নিশানাথ হীনপ্রভ, তারকাদল বিদায় লইয়াছে। নভোরাজ্যের সুনীল আস্তরণ এখন শূন্য-প্রায়। যদিও বর্ষা ঋতুর সমাগম হইয়াছে, তথাপি বৃষ্টির অভাবে গ্রীষ্মের প্রখরতায় প্রাণীগণ ক্লিষ্ট। সমীরণ অলস হইয়া যেন কোন পর্ব্বত গুহায় অঙ্গ ঢালিয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ, লতা, পাতা যেন তদ্‌বিরহে অবনতবদনে নির্জ্জীব ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি নিজের কামরায় বসিয়া কেবল প্রকৃতির বাহ্য শোভা দেখিতে লাগিলাম। আর মধ্যে মধ্যে আর একটি লোকের কথা মনে পড়িতে লাগিল, তাহারও কুরুক্ষেত্র দর্শনের নিতান্ত অভিলাষ ছিল। আমার সঙ্গীটি নিরুদ্বেগে শয্যায় পড়িয়া নিদ্রাদেবীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

ভোর ৬৷৹ টার সময় আম্বালা ষ্টেসনে উপনীত হই-লাম। এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের থানেশ্বরের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। তখন কলিকাতা হইতে বম্বে মেইল আসিয়াছে। সে গাড়ীখানি লাহোর হইয়া রাওলপিণ্ডি যাইবে। এ ট্রেণ না বাহির হইলে থানেশ্বরের গাড়ী ছাড়িবে না, সুতরাং বিলম্ব দেখিয়া আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেডিজ্ ওয়েটিং রুমে গিয়া অপেক্ষা করিলাম। সেখানে আয়াজী ছাড়া, শ্রীমতী-টিকিট-কলেকটর মহোদয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন দেশীয় মহিলা। শ্যামাঙ্গিনী আপন পদমর্য্যাদা রক্ষায় যেন বিশেষ ব্যস্ত। ট্রেণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া তাঁহার দেহমনের গতিও দ্রুতগামী হইয়াছে, প্রকাশ পাইতেছে। আমার সঙ্গে হিন্দী ভাষায় দুচারিটি কথা হইল, অবশেষে স্বীয় সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে শাসনানুরোধে ইংরাজী বুলি বাহির করিলেন। যা'হোক এইরূপে আমার ওয়েটিং রুমের সময়টুকু অতিবাহিত হইলে পর আমার সঙ্গী মহাশয় আসিয়া আমাকে ডাকিলেন। তিনি এতাবৎকালের মধ্যে নিজের প্রাতঃকৃত্য সারিয়া দু এক জন পরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলেন। তিনি ট্র্যাবেল (travel) করিতে বড় মজবুত, রেলগাড়ী তাঁহার ঘরকন্নার মতন। আমরা প্ল্যাটফরমে বাহির হইয়া দেখি, থানেশ্বরের গাড়ী আসিয়াছে। আজকাল তীর্থের সময় নয় বলিয়া যাত্রীর সংখ্যা কম। কেবল তৃতীয় শ্রেণীর পাঞ্জাবী যাত্রীই দেখা গেল। উহারা কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত "পেহবা" নামক স্থানে মৃতের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিতে যায়। সে স্থানটি হিন্দুদের গয়াক্ষেত্রের ন্যায়।

আমরা নিজেদের কম্পার্টমেন্ট (কামরা) সমস্ত অধিকার করিয়া বসিলাম। বেলা ৭টার পরে গাড়ী ছাড়িল। তখন তরুণ সূর্য্যের নব কিরণ বর্ষাজলসঞ্চিত খাল বিলের হিল্লোলের উপরে ঝলমল করিতেছে। দুধারে প্রশান্ত ক্ষেত্ররাজি এখন শূন্য। মধ্যে মধ্যে কৃষকগণ হল চালনা করিতেছে। তাহাদের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ শস্যদ্বারা তাহারা দুর্ভিক্ষের তাড়না হইতে পরিত্রাণ পায় না। আম্বালা হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বর।

বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমরা থানেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এ ষ্টেশনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এক বিষয়ে ঐক্য প্রায় অধিকাংশ তীর্থস্থানেই দেখা যায়; এখানেও আমরা ষ্টেশনের বাহির হইবামাত্র, কতক-গুলি পাণ্ডা-বালক মধুমক্ষিকার মতন আসিয়া আমা-দিগকে বেষ্টন করিল। আমরা অত্রত্য উৎকৃষ্ট উচ্চ একা যানে আরোহণ করিলাম। এরূপ যানে উঠানামা শুষ্ক অন্নভোজী বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে অসাধারণ ব্যায়াম বটে। পাণ্ডা-বালকগণ কেহ অগ্রে, কেহ পশ্চাতে, কেহ ঘোড়ার মুখের নিকটে নিকটে ছুটিতে ছুটিতে চলিল, আর তাহাদের অভ্যস্ত বাক্যগুলি— "বাবু মশায় নিবাস কোথা, নাম কি, আমার সঙ্গে চলুন, ভাল বাসা আছে," ইত্যাদি অনেক প্রকার স্তোক-বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল, শীকার হাতছাড়া হয় বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বচসাও আরম্ভ হইল।

ষ্টেশনের নিকটেই তহশিল, সম্মুখে পরিসর রাজপথ। দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। প্রায় দুই মাইল পার হইলে কুরুক্ষেত্র সহরের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। কতকগুলি ছোটখাট মুদির দোকান ও তরিকারি এবং মিষ্টান্ন ও অন্যান্য নিত্য আবশ্যকীয় বস্তুর দোকান রহিয়াছে; তার মধ্যে একখানি মুসল-মানের অন্ন ব্যঞ্জন ও রুটির দোকান এই মহাতীর্থে দেখিয়া আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। পরে জানিতে পারিলাম, যে এখানে মুসলমান অধিবাসীও

আছেন। আমাদিগকে দেখিবামাত্র আমাদের পাণ্ডাঠাকুর নিজের বাসা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিলেন। ব্যাধকে দেখিলে পক্ষিগণ যেরূপ আপনি পালায়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডা-বালকগণ এই পাণ্ডা ঠাকুরকে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। ইঁহার নাম নিরঞ্জন ঠাকুর, লোকটি শান্ত, শিষ্ট, লেখা পড়াও জানেন, কথাবার্ত্তায় অতি সভ্যভব্য। উর্দ্দু উচ্চারণ বিশুদ্ধ। মান সম্ভ্রমও আছে বলিয়া বোধ হইল। ইনি অত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটির একজন মেম্বর। পাণ্ডা ঠাকুরের পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত। আমার মাতৃদেবী ও ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতা সকলেই ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া আমার পরিচয়ের বিস্তর ব্যাখ্যা করিতে হইল না। নিরঞ্জন ঠাকুর ও তাঁহার আর এক জন অনুচর প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পথের পার্শ্বে অনেক ভগ্নগৃহ ও পুরাতন ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। আর যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বিস্তীর্ণ প্রান্তর,—পলাশ ও বাবলা গাছে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তবে আম-জামের গাছের সংখ্যা যে নিতান্ত কম তাহা নহে।

এখানে ছয় সহস্র লোকের বসতি, কয়েকটি সংস্কৃত টোলও আছে। পূর্ব্বে এই কুরুক্ষেত্র অম্বালা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু একবার পর্ব্বাহ উপলক্ষে কলেরা হওয়াতে ডেপুটি কমিশনর চেষ্টা করিয়া উহা আম্বালা হইতে ছিন্ন করিয়া, কর্ণালের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অধিবাসীরা এ জন্য অসন্তুষ্ট। অপেক্ষাকৃত উন্নততর সঙ্গে বঞ্চিত হইয়া কুরুক্ষেত্রবাসীরা আন্তরিক পীড়িত হইলেও এমন শক্তিসাহস এ অঞ্চলের কাহারও নাই, যে প্রজার দুঃখ-ক্রন্দন রাজার কর্ণগোচর করে। প্রায় দশ বৎসর হইতে তাহারা নীরবে অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

আমরা প্রান্তরবাহী সমীরণ সেবন করিতে করিতে প্রথমে গন্তব্য স্থানে চলিলাম। পথে কতবার কত জন পাণ্ডা বই খাতার পোঁট্‌লা ঘাড়ে করিয়া যাত্রী পাকড়াও করিবার জন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। "মশায় নিবাস কোথা, কি জাতি কি ব্যবসা", ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্নদ্বারা বিরক্ত করিতে লাগিল।

যা'হোক আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থান কুরুক্ষেত্রের প্রধান তীর্থস্থল। ইহা একটি অতি বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী বা হ্রদ, ইহার পরিসর চারি ক্রোশ। চতুর্দ্দিকে ঘাট বাঁধা, ইহার সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন কিংবদন্তী আছে। আমরা তপনতাপে ক্লান্ত হইয়া সেই সুন্দর কমলদামপূর্ণ সরোবরতটে বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্রান্তি দূর করিতে বসিলাম। তথায় একটি ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করিতেছিল, সেও সোৎসুকে পাঠ ছাড়িয়া, "বাবু কোথাকার বসতি কি জাতি," ইত্যাদি প্রশ্ন করাতে, সঙ্গী মহাশয় বলিলেন, "আপ্ পাঠ করো।" তাহাতে সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "পাঠ করিব ত খাইব কি? আরে আগে ত খাওয়ার সংস্থান চাই!" তাহাতে বাবুটি উত্তর দিলেন, "খাওয়ার ভার আমি ত লইতে পারি না।" সে বলিল, "অবশ্য! কেন না, আমরা ব্রাহ্মণ, হিন্দুমাত্রেই আমাদের জন্য দায়ী।" সর্ব্বত্রই কেবল "দেহি দেহি", সর্ব্বত্রই 'অন্নচিন্তা চমৎকারা।' আর সকলই যেন উপলক্ষ মাত্র। যা'হোক আমরা পাণ্ডারূপ মক্ষিকার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সরোবরে অবগাহনার্থ একটি নির্জ্জন ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই সরোবর চারি ক্রোশ বিস্তীর্ণ, ইহার তৃতীয়াংশ রক্ত-কোকনদের আবাস, জল আর তথায় দেখা যাইতেছে না। কেবল পদ্মপত্র ও পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডা ঠাকুর কহিলেন, "হিঁয়া পাচোঁ পণ্ডাকা মকান রহা।" এই হ্রদের দ্বাদশটি নাম আছে ঃ—ব্রহ্মসরোবর, কুরুক্ষেত্র, সমন্ত-পঞ্চক, দ্বৈপায়ণহ্রদ, লক্ষ্মী-কুণ্ড, ইত্যাদি। একটি একটি নামে একটি একটি আখ্যায়িকা যুক্ত। তাহা কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য পাঠে বিশেষ রূপে জানা যায়।

"কুরুক্ষেত্র" সম্বন্ধে এইরূপ শোনা গেল ঃ—একদা মহারাজ কুরু মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তথায় কতকগুলি—প্রায় এক শত—মৃগী ও একটিমাত্র মৃগ চরিতেছিল। রাজা মৃগটিকেই বধ করিলেন, তাহাতে মৃগীগণ অতি কাতর হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিল। রাজা কুরু সেই পাপ ক্ষালনার্থে ইন্দ্র ও কুবেরের নিকট হইতে দুইটি অস্ত্র চাহিয়া আনিলেন এবং স্বীয় বৈভব সকল দানাবশেষে এই সরোবরে স্বীয় প্রত্যেক অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া নিক্ষেপ করতঃ সেই হ্রদে লুপ্ত হইলেন। তদবধি "কুরুক্ষেত্র" নামে

এই হ্রদ অভিহিত হইল। এইরূপে জামদগ্ন্য ঋষি যৎকালে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন তখন "সমস্ত-পঞ্চক" নাম হয়।

অতঃপর আমরা সেই বদ্ধসলিলা, পূত লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া কুন্তীশ্বর-মহাদেব দর্শন করিতে গেলাম। ইহাও উক্ত হ্রদের অপর তটে অবস্থিত। মন্দিরটি প্রাচীন নহে, কিন্তু সন্নিহিত বটবৃক্ষটি দেখিলে পুরাতন বলিয়া জ্ঞান হয়। বৃক্ষটি বৃহৎ ও ঘন জটাভারে অবনত।

আমরা রৌদ্র ও গ্রীষ্মের আতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যান্য দেবস্থানে আর যাইতে পারিলাম না। বাসাভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। এই গ্রামখানিতে লোক জন সকলি আছে তবু যেন সজীবতা নাই। বাস্তবিক সকলি যেন শূন্যতাময়, নিরানন্দমাখা।

আমরা নিরঞ্জন ঠাকুরের বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানা গৃহে স্থান লইলাম। ঘর খানিতে এক খানি খাট, দুই খানি চেয়ার ও মাটিতে সতরঞ্চি মোড়া। ঘরের চারি দিকে দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য বিবিধ ছবি এবং পাণ্ডা ঠাকুরের চারি বৎসর বয়স্ক পুত্রের ও বন্ধুগণের ফটো, একটি ক্লক ঘড়ি ও ল্যাম্প টাঙ্গান আছে। অভাব অনাটন কিছু নাই। ঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গণ, তাহাতে ফুলের গাছও আছে। পার্শ্বে গুপ্তগৃহও ছিল। এক কথায়, প্রয়োজনীয় সকলি ছিল। পাণ্ডা ঠাকুর দুই জন ভৃত্য আমাদের জন্য নিয়োজিত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণটি আমাদের জন্য খাদ্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিলেন, শূদ্র ভৃত্য তদুপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিল। আমরা জলযোগাদি করিয়া নিজের শয্যা রচনা করিয়া বিশ্রাম করিলাম। অবশেষে বেলা ৫টার সময় পাণ্ডা নিরঞ্জন ঠাকুরের বই খানিতে নিজের ও শ্বশুরবাড়ীর সকলের নাম ধাম লিখিয়া দক্ষিণা দান করিলাম।

যাইবার সময় মনে হইল, এক বার গৃহিণীটিকে না দেখিয়া যাওয়া নিতান্ত অনুচিত। আমি বহিঃপ্রাঙ্গণ পার হইয়া দ্বিতীয় দ্বার দিয়া ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখের দালানে এক খানি ছোট চৌকিতে একটি দ্বাবিংশ বর্ষীয়া যুবতী ক্ষুদ্র একটি শিশু ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; আমাকে দেখিবামাত্র হাস্যমুখে আহ্বান করিলেন, —"আও মাইজী, বয়ঠো।" যুবতীর পরিধানে একখান রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি, গায়ে একটি কঞ্চুলিকা, হাতে দুই গাছি সোণার বালা ও কতকগুলি কাল চুড়ি, কাণে মাকড়ি ও দুল। পায়ে অতি স্বগ্ন জড়েন মল। নাসিকার উভয় পার্শ্বেই নাকছাবি। এক খানি বড় ও এক খানি ছোট। সুন্দরীর মুখের আবরণ খানি যেন বিমল চন্দ্রমণ্ডলের উপর মেঘাবরণ। তাঁহার শিরোভূষণ একটি স্বর্ণকৌটাবৎ। পেটেপেড়ে চুল বাঁধিয়াছেন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার পরিচয় অন্নসন্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই বলিলেন, "আপনার মতন চুড়ী গড়াইয়া দিতে পারেন?" জ্যাকেট ও সেমিজের মর্য্যাদা বুঝেন দেখিলাম। সর্ব্বদা বাঙ্গালী যাত্রীর সংসর্গে ইঁহাদেরও রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই ক্ষণকালের আলাপে আমি যেন তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া পড়িলাম। তিনি অবাধে নিজের সুখ দুঃখের অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। ইহাকেই কি রমণীর সরলতা বলে না!

বেলা অবসানে আমাদের মহা-আরামদায়ী যান খানি ঝন্ ঝন্ শব্দে আসিয়া উপস্থিত। আমরা তথাকার এক-জন লোক (পথ প্রদর্শক স্বরূপ) লইয়া চলিলাম। সেই উচ্চ নীচ অসমান ভূমিতে এক্কাখানি সবেগে ধাবিত হইল। আমি সঙ্গীটির সতর্কতা অনুসারে প্রাণপণে ডাণ্ডাটি ধরিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। খানিক পরেই আমরা নির্জ্জন বনপথে গিয়া পড়িলাম। পলাশ-বাবলাবৃক্ষসমাকীর্ণ সুবিস্তৃত বনভূমিতে আর কোন ফলপুষ্পের বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম না। দিবসের শেষে ধরিত্রী এস্থলে নিতান্ত নীরব। একটি পক্ষীর কূজনও সেই স্থানে কর্ণগোচর হইতেছিল না। বাস্তবিক যেন শ্মশানভূমি নীরবে নিরানন্দে অতীত স্মৃতির সাক্ষী স্বরূপ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সে-স্থলে সংসারের কোলাহল কিছুমাত্র নাই। আকাশ ও ভূতল এক ভাবে শান্ত সমাহিত হইয়া আছে। সবিতৃদেব অস্তগামী প্রায়। গগনে রজতবর্ণ চন্দ্রমা অনিমিষে, অপরাহ্নের বনশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সেস্থলে সুখকর কাননচারী সমীরণ অবাধে ছুটা ছুটি লুটা লুটি করিয়া খেলা করিতেছিল। দিনের বেলায়

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তীর্থভক্তি শিথিল হইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন মধুর সান্ধ্য মুক্ত বায়ু যেন ক্লান্ত দেহে বল দান করিল। কুরুক্ষেত্রের প্রশান্ত ভূমি ও মাঠ ময়দানই প্রধান দর্শনীয়। কয়েকটি দেবমন্দিরও আছে,যেমন ভদ্রকালী, থানেশ্বর শিব, বানগঙ্গা, স্বরস্বতী নদী প্রভৃতি। কিন্তু সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত আমার খণ্ড ভাগ্যে বেশী কিছু ঘটিল না। কেবল "জ্যোতিঃসর" নামক স্থানটিতে গেলাম। আমাদের বাসস্থান হইতে ইহা ৩ মাইল দূরে। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে সেই জনহীন প্রান্তর সান্নিধ্যে একটি পতিত সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলাম। অসমান স্থান বলিয়া একা হইতে নামিতে হইল। মহান্ জটাধারী বটবৃক্ষ অঘোর যোগীর ন্যায় বিজন ভূমিতে নিস্তব্ধে বাস করিতেছে। তাহার জটা ভূমিতে পতিত হইয়া দ্বিতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত শিকড়গুলি ভিতরে ভিতরে গজাইয়াছে। তাহার পার্শ্বে ছুটি জীর্ণ মন্দির। একটিতে "জ্যোতীশ্বর মহাদেব", আর দ্বিতীয়টি এক খানি ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তরের রথ, উহাতে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। একজন দণ্ডী স্বামী প্রায় ৩।৪ বৎসর হইতে এই নির্জ্জন মন্দিরে বাস করিতেছেন। তিনি দর্শকগণকে দেখাইয়া শুনাইয়া থাকেন ও দক্ষিণাদি গ্রহণ করেন। পাণ্ডবেরা জ্যোতীশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ফুল-চন্দন-ধুপ-দীপবর্জ্জিত, শুষ্ক মরুবৎ দেবালয়টির পরেই আর একটু উচ্চভূমির উপর আরও একটি প্রাচীন ও সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিলাম। দণ্ডী স্বামী কহিলেন, "এই বৃক্ষ পাঁচ সহস্র বৎসরের, ইহার ছায়াতে দাঁড়াইয়া শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে গীতোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বটবৃক্ষটির গোড়া বহুদূর বিস্তৃত বটে। নীচে ইষ্টক দ্বারা গাথাঁ। সেই মুহূর্ত্তে অতীতের সেই মহান দৃশ্য, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-যুধিষ্ঠির-ভীমাদি পরিচালিত সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসমাকীর্ণ, অসংখ্য রণশঙ্খনিনাদ-বিক্ষোভিত সেই রণস্থল যেন মানস চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। বিস্মিত, স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সেই পুণ্য মহীরুহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। এই কি সেই মহাবৃক্ষ যাহার নিম্নে আত্মজনবধবিরাগী মহাবাহু মধ্যম পাণ্ডব কাতরচিত্ত ও অবসন্নদেহ হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন? এই কি সেই বৃক্ষ যাহার নিম্নে জগতে অতুলনীয়, মানবের পরিত্রাণপ্রদ গীতার উপদেশমালা বিবৃত হইয়াছিল? সেই আদি বৃক্ষ না হউক, ইহা তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে বলিয়াই পবিত্র, পুণ্য বৃক্ষ। ইচ্ছা হইল ইহার দু চারিটি পাতা বাড়ী লইয়া গিয়া প্রিয়জনকে উপহার দি। কিন্তু বৃক্ষটী অত্যুচ্চ বলিয়া পারিলাম না।

জ্যোতিঃসরের সকল জ্যোতি এখন শৈবালে আবৃত হইয়া আছে। স্বামীজী আমাদিগকে সরোবরে নামিয়া আচমন করিতে কহিলেন। আমারও সেই পবিত্র কুরুপাণ্ডব ও আর্য্য মুনিঋষিগণের অস্থিকঙ্কালপ্রোথিত ভূমিতে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদিদ্বারা ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিতে বাসনা হইল, কিন্তু গাইডটি ব্যস্ত ছিলেন, পাছে ট্রেণ ছাড়িয়া যায়, অতএব নিরস্ত হইলাম। ফিরিবার সময় অন্য পথ আশ্রয় করিলাম। এ পথটীও নিতান্ত জনহীন, সন্ধ্যার আঁধারে বনপথ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। আমি মনে করিলাম, এই সময় যদি দশ পাঁচ জন দুষ্ট লোক আমাদিগকে আক্রমণ করে! আমাদের অস্ত্রের মধ্যে ত সম্বল কেবল একাওয়ালার সরু চাবুক গাছি। আমার সঙ্গী মহাশয় গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোই জানোয়ার ত নাহি আতা?" সে বলিল, "নাহি, সের নাহি আতা।" সেই দীর্ঘ পথ সত্বর অতিক্রম করিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখা গেল, মাঝে মাঝে দু এক জন কৃষক কতকগুলি গো মহিষ লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, গরুগুলি শুধু অস্থি-পঞ্জরসার; কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিল, "থানেকো নাহি তব ৮ বরস ধর ছোড় দিয়া।" দুর্ভিক্ষের ক্রন্দন! পথে কৃষক ছাড়া আরও স্থানে স্থানে দু একটি লোক মাটিতে বসিয়া আছে দেখিলাম,—মলিন বেশধারী, নিতান্ত দীনহীন আকৃতি। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তারা "জমীদার।" আমরা জমীদারের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্! পরে শুনিলাম, যার একটু জমী আছে এদেশে তিনিই জমীদার। যা'হোক পৌনে নয়টার ট্রেণ ধরিতে হইবে বলিয়া আমরা আর অন্যত্র গেলাম না। প্রায় আধ

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন।

80(A)